KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২০/৪৮, ভেলপুরা, কালীধাম
Collection : KLMLGK	Publisher : সুরেশ চক্রবর্তী
Title : উত্তরা	Size : 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number : 9/2-9, ৯ ৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ, ১৩৩৯ - ফাল্গুন, ১৩৩৯ আশ্বিন, ১৩৪০
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : সুরেশ চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র

অষ্টম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪০ | চতুর্থ সংখ্যা

গান

সুর– পিলু গজল

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

ওগো, ক্রন্দসী পথচারিণী,
তুমি কোথা যাও তুমি কারে চাও ?
কি ব্যথা তব অন্তরে,
ও বিষাদিনী, মোরে বলে যাও।

বন্ধুর পথ অজানা,
বন্ধুর ঘর জাননা,
তুমি পথিকে কত শুধাবে
—'কোথা গেছে সে পথ বলে দাও' ?

সঙ্কটময় ভুবনে,
চলিবে একা কেমনে ?
কোন চঞ্চল তাড়নে
বঞ্চিলে নিজ ভবনে ?

এসগো, অয়ি অঙ্গনে,
এসগো এই অঙ্গনে,
দেখ তল্লাসি এই অন্তরে
তুমি যারে চাও যদি তারে পাও।

পত্র

দার্জ্জিলিং—১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

মণ্টু

তোমার পূর্ব্ব চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব করিনি। যদি না পেয়ে থাকো তবে পত্রদৌত্যবিধাতা ডাকঘরকে দোষ দিয়ো। কিছুদিন হ'ল আমার একখানা চিঠি ডেড লেটর অফিস থেকে আমার কাছে ফিরে এসেছিল। বড়ো দুঃখেও মনে মনে হাসি পেল—আমার কতো পত্রই ডাকঘরের গর্ভপাত স্বরূপে মারা গেছে, হিজ্ ম্যাজেষ্টিজ্ পোষ্টাল পাণ্ডারা তাদের সবগুলোকেই কি পিণ্ডি দিয়েচে কেবল এই একটি মাত্র প্রেতকে ছাড়া? এবার তোমাকেও যে চিঠিখানা লিখেছিলুম সেটাও কেবলমাত্র মরেচে তা নয়, তার কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়েচে, সে আর ফিরবে না।

আজকাল খুব দরাজভাবে কুঁড়েমি করি, সুতরাং আর যা কিছু কর্ত্তব্য আছে তার অবকাশ খুব সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেচে। এমন দিন ছিল যখন চিঠি পেলেই তার উত্তর দেওয়া আমার একটা ব্যসনের মতোই ছিল, এখন সেই রিপুটা প্রায় ছেড়েছে বল্‌লেই হয়। ভূতটাকে আমার স্কন্ধ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অমিয়র উপরে চালান ক'রে দিয়েছি। অনেকে তার হস্তাক্ষর আমারই মনে ক'রে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌বে। ভাবীকালের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের জন্যে গবেষণার খোরাক জমা হচ্চে। হয়ত ৩৯১০ সালে এই গোড় দেশেই কোনো পণ্ডিত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবেন যে, রবিঠাকুর ছিল Solar myth, তাঁর একচক্র রথের বঙ্গীয় নাম ছিল অমিয়চক্র, এইজন্য তাঁর বাহনের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তাঁকেই বলা হ'ত অমিয় চক্রবর্ত্তী। ডকুমেণ্টরি এভিডেন্স থেকে দেখানো শক্ত হবে না যে, ভারতের পূর্ব্ব গগনে যেখানে রবিঠাকুরের পীঠস্থান, অমিয় চক্রবর্ত্তীর অধিষ্ঠানও ঠিক্ সেই একই স্থানে। ভাবী জন্মে আমি হয়ত অতি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য সহকারে এই মত সমর্থন ক'রে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনশ্চ ডাক্তার উপাধি লাভ ক'রে সম্মানিত হব। আশা করি, আমার প্রতিপক্ষ কোনো এক অধ্যাপক আমার আজকের লেখা এই চিঠিখানা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে রবীন্দ্রনাথের ভাবী জন্মান্তরীণকে যথোচিত লাঞ্ছিত করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে উপাধিদাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও।

এবারে তোমার রাণীমাসীর যোগে এই চিঠি তোমার কাছে পাঠাব। বরাহনাগরিকার স্পর্শমন্ত্রগুণে* যদি এ চিঠিখানা রক্ষা পায়। ইতি।

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*শ্রীমতী রাণী মহলানবিশ সে সময়ে বরাহনগরে বাসা ক'রেছিলেন।

বীরবলের পত্র

বীরবল

আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, যে এদানিক আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি। দেশে অনেক পুঁথি, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র আছে, যাদের সঙ্গে আপনি অবশ্য সুপরিচিত। কিন্তু এ সব স্থলে আপনি কি বীরবলের লেখা দেখতে পান?

আমি যে লিখিনে তার প্রথম কারণ—আমার মনের যৌবনে এখন ভাটা ধরেছে। আমি বিশেষ করে মনের যৌবনের কথা বলেছি, কারণ দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবন সমধর্ম্মী হলেও—এ দুই এক নয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের মনের যৌবন আজও পুরো বজায় আছে, যদিচ তিনি দেহের যৌবনের কাছে বহুকাল পূর্ব্বে বিদায় নিয়েছেন।

এখন যৌবনের ধর্ম্মই হচ্ছে জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা। যখন আমাদের ভিতর স্ব-নামক পদার্থটি জেগে ওঠে তখন আমরা লেখায় সেই স্ব-বস্তুটিকে ফুটিয়ে তুলতে চাই, স্বকীয় মনোভাব স্বকীয় ভাষাতেই ব্যক্ত করতে চাই। তখন কি চিন্তা, কি ভাষা কোন বিষয়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী হইনে। আর আমাদের চিন্তাই আমাদের ভাষাকে গোড়ে তোলে।

বীরবলী ভাষার যদি কোন বিশেষত্ব, কোনও গুণ থাকে, ত এই কারণে আমার মনই যে ভাষা গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ সে ভাষা সাহিত্যরাজ্য থেকে ধার করা ভাষা নয়। এই কারণে প্রথম প্রথম সমালোচকরা আমাকে কিং স্বাতন্ত্র্যে অবলম্বসে বলে ধমক দিতেন—যদিচ আমার বীরবলী ভঙ্গীটি পছন্দ করতেন। তাঁরা বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি যে বীরবলের বক্তব্য বাদ দিলে তার ভঙ্গীটির কোনও অর্থ থাকে না। যাঁরা ভাষার psychology সম্বন্ধে অন্ধ তাঁরাই philology নিয়ে আস্ফালন করেন। সে যাই হোক বীরবলী ঢংয়ের লেখা লেখবার আমার এখন প্রবৃত্তি নেই। তার কারণ এ প্রবৃত্তির মুখে যে শক্তি ছিল, সে শক্তি আজ নেই।

তবে বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর ভাষা চুরি করে—এ কথা বলতে পারি যে

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

সেই জন্যই ত লিখতে ভয় পাই। কারণ ঐ গুঁড়োটুকু ছিবলেমির গুঁড়ো।

আর দেখতে পাই বাঙালী-সাহিত্য-সমাজ ঘোর serious হয়ে উঠেছে। বীরবলকে কেউ কখনো, serious লেখক বলে মনে করেন. নি, চিরকালই ছিবলে লেখক বলে গণ্য করেছেন, তাঁর লেখায় অন্ততঃ ঐ গুঁড়োটুকু অল্প বিস্তর ছিল বলে।

Serious লেখা আমিও হয়ত লিখতে পারি, যদি কেউ বুঝিয়ে দেন যে serious লেখার অর্থ কি?

আমার ত মনে হয় যে serious শব্দটি অনেকে স্বধু negative অর্থে ব্যবহার করেন অর্থাৎ যে লেখার ভিতর রূপরস গন্ধ তেজের স্পর্শ মাত্র নেই সেই লেখাই serious। ইংরেজ দার্শনিকরা এককালে বলতেন যে বস্তুর দু-রকমের গুণ আছে—এক Primary quality আর এক secondary quality, আর রূপরস গন্ধ প্রভৃতি সবই secondary quality আর ঐ কটি গুণকে মন থেকে ছেঁটে দিলেই বস্তুর স্বরূপের সাক্ষাৎ মেলে। সম্ভবতঃ—এই একই মত অনুসারে লেখার এই প্রক্ষিপ্ত গুণগুলি বাদ দিলেই লেখা serious হয়ে ওঠে অর্থাৎ তখন লেখার দেহে থাকে—একমাত্র ভারী সত্য ভাবের ইংরাজী নাম হচ্ছে weight যাকে সত্য সত্যই serious কথা বলে, সে শ্রেণীর কথা যদি কেউ তোলেন, তাহ'লে তার আলোচনাতে আমরাও যোগ দিতে পারি।...তা যে পারি তার একটা উদাহরণ দিই।

বছর তিনেক আগে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় উত্তরার মারফৎ আমাকে একখানি লম্বা খোলা চিঠি লেখেন এবং একটি serious বিষয়ে আমাকে আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। আর সে আলোচনায় আমি স্ফূর্ত্তি করে যোগ দিই এবং আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তও এ আলোচনায় যোগ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি।

পরে আমাদের এই পত্রাবলী একত্র করে একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করি।

এখন জিজ্ঞাসা করি বাঙলার serious পাঠকের মধ্যে ক'জন তা পড়েছেন; যদিচ এ আলোচনার বিষয় ছিল—"ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।" শুনতে পাই যে ভারতবর্ষের লোক হচ্ছে ধর্ম্মপ্রাণ, আর তারা যদি কোনও বিষয়ে serious হয় ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে। অপর পক্ষে আমাদের যে বিনষ্ট শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান, সুতরাং এ দুয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করবার চেষ্টা নিরর্থক নয়।

অবশ্য serious লোকরা এ কথা বলতে পারেন যে বিষয় ভারী হলেও আমার লেখাটা হয়েছিল হাল্কা—অতএব সে লেখা পড়তে তাঁদের লোভ নেই। মানছি এ দোষ আমার নিজস্ব গায়ে আছে। কিন্তু শ্রীমান কুমার ত ঘোর serious এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিবলে লেখক বলে পরিচিত নন।

বাঙালী পাঠকদের এই ঔদাসীন্য থেকে যদি অনুমান করি যে পাঠকেরা serious বিষয়ে উদাসীন তাহলে—সে অনুমানটি ভুল হবে? আর এক কথা।

Serious বিষয় কি হাল্কা ভাবে লিখলেই তার জাত যায়? আমার ত তা মনে হয় না। যে সব বিলেতী বৈজ্ঞানিক চূড়ামণিদের বই পড়ে আমরা বিজ্ঞানের নতুন মতিগতির আলোচনা করি, তাঁরা কি সকলেই খুব গম্ভীর লেখক? Eddington-এর বই পড়ে দেখবেন। তাঁর লেখা এত ফুরফুরে যে লেখক হিসেবে তাঁকে কি বলে লোক ছিবলে লেখক বলবে। আর Jeansএর Mysterious Universe নাকি লক্ষ লক্ষ করে বাজারে বিক্রী হয়েছে। বিলেতের লক্ষ লক্ষ লোক কি বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত?

Jeans-এর বইয়ের এতাদৃশ কাট্‌তি দেখে এই মনে হয় যে সে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে interest আছে উপরন্তু তাঁর লেখা অতিশয় প্রাঞ্জল অর্থাৎ হাল্‌কা। অর্থাৎ তিনি ভাষার সূক্ষ্ম শরীর ধ'রে করতে জানেন। সুতরাং লেখবার ধরণ হালকা হলে বিষয়ের গুরুত্ব লক্ষ্য হয় না।

আপনি যে আমাকে লিখতে অনুরোধ করেন,—তার কারণ এই নয় যে আপনি মনে করেন যে আমার রচনার গৌরব হচ্ছে তার লঘুতা।

আজকাল কেন লিখিনে, তার লম্বা কৈফিয়ৎ দিলুম। এখন আপনি যদি কোনও serious বিষয় ধরিয়ে দেন—তাহলে আমি স্ফূর্ত্তি করে সে বিষয় আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি, আমি ধর্ম্মকে ছুঁতে ভয় পাই নে, বিজ্ঞানকেও নয়।

[উত্তরা সম্পাদককে লিখিত]

সুরের স্বারাজ্য

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গত বৎসর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়, সঙ্গীতের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি মূল্যবান তত্ত্বের আলোচনার প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে রবীন্দ্রনাথের 'খাতিরে' সান্যাল মহাশয়ের 'খাঁটী কথা' খুব সমারোহের সহিত 'ধামা চাপা' ও সমাধিস্থ করা হয়েছিল (উত্তরা, মাঘ, ১৩৩৯, ৫৭৮ পৃঃ)। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে 'সুযুক্তির' সাহায্যে সান্যাল মহাশয়ের প্রতিবাদ ঢাক ঢোল বাজিয়ে 'কবর' দিয়েছিলেন, 'উত্তরার' সম্পাদকের সৌজন্যে, আমি এই প্রবন্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুযুক্তির কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিয়া, সান্যাল মহাশয়ের প্রতিবাদের সপক্ষে দুটো কথা বলতে চাই। দেশে ও বিদেশে, সঙ্গীতের আলোচনা ও সাধনা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ কচ্ছে। সুতরাং সঙ্গীতের মূল সূত্র ও ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা যত স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়, সঙ্গীতের প্রসার ও উন্নতির জন্য তাহা নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক।

সুরের জগৎ যে কথার জগৎ হইতে ভিন্ন, সুরের রাজ্য এবং কথার রাজ্য যে দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক দেশ, আমরা অনেক সময়ে এই সত্যটি বিস্মৃত হই, এবং অনেক সময়ে সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের খাতিরে, কথাটা স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নই। সুরের কারবারী সুরের স্বাধীনতা, বা স্বারাজ্যের দাবী খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করে থাকেন,—কথার কারবারীরা, বেশীর ভাগ গায়ের জোরে এবং খুব অল্পই যুক্তির জোরে, দাবীটা অস্বীকার করে আসছেন। সুরের ও কথিত-ভাষার এই যে দ্বৈতভাব, সুরের ও সুরহীন রাজ্যের এই যে দুটি বিবদমান বৈরীভাব, সৃষ্টিতত্ত্বের একটি প্রধান ও গুহ্য কাহিনী। সাধারণতঃ, জনপ্রিয় প্রচলিত সঙ্গীতে, সুরের ও কথার যে সাময়িক সম্মিলন (alliance) ও সন্ধি (entete cordiate) হয়, এই জনপ্রিয় সৌহার্দ্যের ক্ষণিক অবকাশে, এই দুইটি বিভিন্ন স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রকৃতিগত স্বারাজ্য (autonomy) আমরা বিস্মৃত হই। কথাবাদী সাহিত্যিকরা এই সম্মিলনকে সাময়িক সন্ধি বলিয়া স্বীকার করিতে চান না, সঙ্গীতকে তাঁরা সাহিত্যের অনুগত করদ-রাজ্য (tributary principality) বলিয়াই জাহির করিতে সচেষ্ট, সঙ্গীতের স্বাধীনতা ও স্বারাজ্য সম্বন্ধে, কঠোর সত্যটা চাপা দিবার জন্য, তাঁহারা সময়ে সময়ে অশোভন ব্যগ্রতা দেখান। বহু বৎসর পূর্ব্বে "সবুজ-পত্রে" প্রকাশিত "সঙ্গীতের সঙ্গতি" নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বাদীদের পক্ষে বক্তব্য-গুলি সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুরবাদীদের পক্ষে যে সব যুক্তি আছে, প্রায়ই তাহার আলোচনা হয় না।

সুরের ও কথার একটা প্রধান ও ভিত্তিগত প্রভেদ এই, যে, সুর, একান্তভাবে না হউক, অন্ততঃ, বিশিষ্টভাবে, ভাবের (emotion). সাম্রাজ্য, কথা ও সাহিত্য, বিশিষ্টভাবে ভাবনার (intellect) রাজ্য। কথার মধ্য দিয়া আমরা অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর রস ও ভাব উজ্জীবিত করিতে পারি, সুরের মধ্য দিয়াও কখনও কখনও ভাবনা ও চিন্তা-জগতের কথা (intellectual thought), বোধ হয়, প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু, চিন্তা-জগতের কথা প্রকাশ করিবার সাহিত্যের যে একটা প্রকৃতিগত বিশিষ্ট শক্তি, বা ক্ষমতা আছে, সুরের ভাষায় তাহার অনুরূপ শক্তি নাই। এই হিসাবে, সুর, 'বে-সুরো' কথার কাছে এখনও হার মানিতেছে। পক্ষান্তরে, এমন অনেক ভাব আছে,—(মানুষের অধ্যাত্ম সমুদ্রের সংখ্যা হীন, সীমাহীন ভাব-লহরী, কোনও পাটীগণিত, অঙ্কাপি, গুণিয়া উঠিতে পারে নাই),—যাহা সাহিত্যের সাহায্যে, কথার ভাষায়, প্রকাশ করা যায় না। এই অসংখ্য,

অথচ মানুষের আত্মার পরম উপকারী ভাব-সম্প্রদায় সুরের রাজ্যেই বাসা বাঁধিয়া আছেন; কথার আবেদনে তাঁহাদের সাক্ষাৎ মিলে না, কেবল সুরের আরাধনায় তাঁহারা সাড়া দেন, এবং মানুষের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাদের পদ্মাসন বিছিয়ে বসেন। কথার 'বেসুরো' শব্দে এই ভাব-দেবীরা মূর্চ্ছিত হন, এবং অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন; সুরের সোনার কাটীর স্পর্শেই ভাবরাজ্যের এই অলৌকিক অপ্সরীদের নিদ্রা ভাঙ্গে। কথা স্তব্ধ হইলেই তাঁহাদের সাক্ষাৎ মিলিবার সম্ভাবনা, কারণ কথার নিগড়ে, এই শ্রেণীর ভাব-রাজ্যের দেবীদের, এই কথা—"সিন্ধুপারের" "বিদেশিনীদের" ধরিতে পারি না, অথচ সুরের সুকোমল শৃঙ্খলে তাঁহারা স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়েন। তাঁহারা সাহিত্য সাম্রাজ্যের "বিদেশিনী", অথচ, সুরের সাম্রাজ্যের native inhabitants—স্বদেশ-বাসিনী। সাহিত্যের সাম্রাজ্যে, প্রায়ই এই ভাব-রাজ্যের দেবীদের, এই সুর-সাম্রাজ্যের ভাবিনীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, কবিতার রাজ্যে কখনও কখনও তাহাদের দেখতে পাই, কিন্তু গদ্য-সাহিত্যের সাধারণ অধিবাসী চিন্তার মল্লগণ ও ভাবনার বীর-পুরুষদের সান্নিধ্যে, সুর-রাজ্যের "বিদেশিনীরা" শীর্ণ ও শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করেন। মুখ্যতঃ, সাহিত্যের আবেদন চিন্তামূলক, ভাবনা-মূলক intellectual, সুরের আবেদন,—ভাব-মূলক emotional। কথার concept এ যে সব মূর্ত্তি গড়ে উঠে,—ভাবে, রসে ও উদ্দীপনায় তাহাদের মূল্য (values) স্বতন্ত্র, সুরের আরাধনায় যে সব মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহাদের ভাব, রস ও উদ্দীপনা (values) স্বতন্ত্র। একের দ্বারা অন্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কথা-রাজ্যের অধিবাসী দ্বারা সুরের রাজ্যের অধিবাসীদের কার্য্য (function) সিদ্ধ হয় না। যে ভাব কথায় প্রকাশ করিতে পারি না, তাহার প্রকাশের জন্য, সাহিত্যের মন্দির অতিক্রম করিয়া, সুরের মন্দিরের দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য্য। কেবল কথাই যদি মানুষের সাধনার পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তা যথেষ্ট মনে কর্ত্তেন, তাহলে তিনি মানুষের কণ্ঠে এই সুরের দান; এই রাগমালার অপব্যবহার করিতে যাইতেন না। প্রজাপতি হলেন Supreme Economist! তাঁহার সৃষ্টিতে অতিরিক্ত দানের (redundant gift) কোনও সার্থকতা নাই। বিশ্বের সুর-পতির এই মহামূল্য দানের একটা মূল্য মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে যাচাই হয়ে গেছে। অধ্যাত্ম-জগতে, কথা যেখানে পৌঁছিতে পারে না, সুর অনেকটা দূর আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কথাকে বাহন করে, অধ্যাত্ম-সমুদ্রে আমরা খুব কম দূরই পাড়ী দিতে পারি,—লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে, কথা পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে ("যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে")। সুর পর-পারের তীরের অনেকটা নিকটে আমাদের নিয়ে যায়,—অন্ততঃ যতটা নিকটে নিয়ে যায়, সাহিত্যের, কাব্যের, বা দর্শনের নৌকা ততদূর পারে না। 'গান-সরস্বতী যে কৈলাস পর্ব্বতে আমাদের বহন করে নিয়ে যায়, গঙ্গা বা সরস্বতী, সে কৈলাসে আমাদের উপস্থিত করিতে পারে না'। * "গানাৎ পরতরং নহি"। সুর অধ্যাত্ম-জগতের মহাযানী পন্থা। এই সুরের জগৎ একটা বিশিষ্ট জগৎ, একটা স্পৃহনীয় জগৎ,—এই জগৎ আমাদের এই চোখে-দেখার জগৎ, এই মাটীর জগৎ, এই গাছ-পালার পাহাড়-পর্ব্বতের জগৎ, এমন কি আমাদের গৃহতারার জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মাঝে মাঝে এই চোখে দেখা মাটীর জগৎ ছেড়ে দিয়ে, কানে-শোনা এই সুরের জগতে একটু বিচরণ করে আসা (week end) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য বড়ই স্বাস্থ্যকর, এবং একান্ত আবশ্যকীয়। সাহিত্যের জগতে, কাব্যের জগতে, বিচরণ করেও, এই চোখে-দেখা মাটী-মাড়ান জগতের বন্ধন থেকে আমরা কিছু কিছু মুক্তি পাই। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি পাই না। কথার আবেদনে (appeal of words) একটা মাটীর জগতের কোলাহলের রেশ, ফল ফুলের গন্ধ, চোখে-দেখা জগতের ভাবনার প্রতিধ্বনি ইন্দ্রিয়-জীবনের অভিজ্ঞতার একটা ছোপ (Colour), আমাদের মনে লেগেই থাকে। নিছক সুরের (abstract music) রাজ্যে, এই মাটীর জগতের প্রভাব, এই প্রতিধ্বনি, এই চাক্ষুষ জগতের স্পর্শ, বর্ণ, ও গন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। কাব্যের তুলনায় সুরের এই অপ্রতিহত স্বারাজ্য একটি বিশিষ্ট

* যথা নয়তি কৈলাসং নগং গান-সরস্বতী ॥
তথা নয়তি কৈলাসং ন গঙ্গা ন সরস্বতী ॥ শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ॥ ১২০ ॥

বস্তু। প্রজাপতির অমূল্য দান। ভাষা হিসাবে সুরের সার্থকতা সাহিত্য ও কাব্য-কলার কিছু উচ্চে, একথা অস্বীকার করা সত্যের অপমাননা।

সাহিত্যের সহিত সুরের তুলনা করিয়া, আমরা সুরের যে বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করি, সাহিত্যের সহিত রূপ-শিল্পের (Plastic Art) তুলনা করিলে, আমরা সেই একই সত্যে উপনীত হই। রূপ-শিল্পের শক্তি ও উদ্দেশ্য (function) সুর-শিল্পের অনেকটা অনুরূপ, এবং কথা-শিল্প বা সাহিত্য হইতে, রূপ-শিল্পের প্রকৃতি-গত ভেদ প্রায় একশ্রেণীর। "লিখিৎপড়িৎ" ভাষা যেখানে হার মেনে পালায়, রূপের ভাষা (Language of Forms), সেখানে আমাদের বিপদের বন্ধু হয়ে উদ্ধার কর্ত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। উত্তরায় প্রকাশিত "লাহোর সাহিত্য-সভার অভিভাষণে", রূপ-শিল্পের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। রূপ-শিল্প ও সুর-শিল্পের মধ্যে যে একটা প্রকৃতি-গত সাম্য (affinity) আছে, এ কথাটা অনেক সময়ে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সুরের রাজ্য এবং রূপের রাজ্য দুটিই, কথার রাজ্যের বাহিরের জগৎ। অনেক ভাব ও রস আছে, যাহা কথার ভাষায় যেমন প্রকাশ কর্ত্তে পারি, রূপের ভাষায় বোধ হয় একই রূপে প্রকাশ কর্ত্তে পারি। আবার এক শ্রেণীর ভাব ও রস আছে, যেগুলি কথার অতীত, রূপের ভাষাতেই তারা ধরা দেয়। যে পরিমাণে কথার অতীত, অনির্ব্বচনীয়, সেই পরিমাণে সুরের ও রূপের মধ্যে একটা সাম্য একটা প্রকৃতি-গত মিল আছে। রূপ-শিল্পীরা রেখা ও বর্ণে, ঐক্যতানের (harmony) আদর্শ লইয়া সৃষ্টি করিতে বসেন। একবর্ণ ও অন্যবর্ণের মধ্যে, অনেক সময় 'বাদী', 'বিবাদীর' সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ফিকে নীলের পাশে, ঐ গাঢ় লালবর্ণটা কেমন খাপ খায় না; কেমন যেন 'বেসুরো' লাগে। অনেক চিত্রের রেখা-ভঙ্গীর 'আরোহণ' 'অবরোহণ', অনেকটা সঙ্গীত-জগতের স্বর-লহরীর প্রকৃতির অনুসরণ করে। সুর-শিল্পের অনেক তত্ত্ব রূপ-শিল্পেরও খাটে। পক্ষান্তরে, রূপ-শিল্পের রেখার ভাষায়, কথিত-ভাষার সহিত একটা সাদৃশ্য আছে। রেখার একটা গল্প বলিবার শক্তি (narrative function) আছে। এই 'গল্প বলিবার', অর্থাৎ যা দেখেছি তাহারই প্রতিলিপি বা প্রতিচ্ছবি দেবার প্রবৃত্তি একটা বুদ্ধিজীবী (intellectual) প্রবৃত্তি। সাধারণতঃ, এই 'রিপোর্ট' লেখবার গরজের মধ্যে, কল্পনা (imagination) বা রস-রাজ্যের ইঙ্গিত দিবার বিশেষ সুবিধা বা অবসর নাই। সাদৃশ্য-প্রধান Realistic Art, আর রস ও ভাব-প্রধান Imaginative Art-এর প্রভেদ এইখানে। রূপ-শিল্পে, ভাবের ও রসের বাহন হল বর্ণ। বর্ণবোধ ও আস্বাদনের মধ্যে কোনও intellectual সুখ-ভোগ নাই †। বর্ণ হ'ল নিছক emotional rapture। কোনও রূপের ছাঁচে না ঢাল্‌তে পাল্লে, বর্ণদ্বারা কোনও কেজো কথাই প্রকাশ করা যায় না। কেবল বর্ণদ্বারা বুদ্ধির রাজ্যের এক 'বর্ণ'ও বোঝাতে পারি না। অথচ, রঙের উপর রঙ চড়িয়ে, ভাব রাজ্যের অনেক 'অব্যক্ত কথাকে', ব্যক্ত কর্ত্তে পারি। সঙ্গীত শাস্ত্রের নিছক সুর (abstract music), চিত্র-শাস্ত্রের বর্ণের মত, ভাব-রাজ্যের বাহন। সুর এবং 'রাগ'-রাগিণী মানুষের মনকে রঞ্জিত করে ("রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"); মনে 'রঙ' ধরায়, মনকে রস-সিক্ত করে, বুদ্ধির কবল হতে মুক্ত করে; সুরের ভাবিনী আমাদের 'ভাব ধরায়' ("তোরে ভাব ধরালে কোন ভাবিনী না জানি সে কেমন ধনি")। সুতরাং, ভাব-বাদী সাত সুরের সঙ্গে, ভাব-বাদী সাত বর্ণের একটা সহোদরোচিত সৌহার্দ্দ্য আছে। সাহিত্য, বা কথা-শিল্প, সুর-শিল্প ও রূপ-শিল্পের 'সতত ভাই,' সহোদর ভাই নহে। সুর-শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে, রূপ-শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে, একটা স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য আছে। সুর ও বর্ণ নিছক ভাব-রাজ্যের (emotion) ভাষা। সাহিত্য, বা কথা-শিল্প মুখ্যতঃ ভাবনা-রাজ্যের (intellect) ভাষা। ইতিপূর্ব্বে বলেছি, এই দুইটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে কখনও কখনও সন্ধি ও সৌহার্দ্দ্যের সম্পর্ক (alliance) ঘটে। গানের মিলন-মন্দিরে, সঙ্গীতের বিবাহ-বাসরে, কথা ও সুরের 'গাট-ছড়া' বাঁধে।

† সুর বোধ ও আস্বাদনের মধ্যেও কোনও intellectual আনন্দ নাই। পক্ষান্তরে ছন্দরচনা, ছন্দ-বোধ এবং তাল-বোধ ও তাল-রচনার মধ্যে একটা intellectual satisfaction আছে।

নিছক্ সুর (abstract music) ব্যাবহারিক সুরে (applied music) পর্য্যবসিত ও পরিবর্ত্তিত হয়;—কিছু কালের জন্য কথার বশ্যতা স্বীকার করে,' আপনার স্বাতন্ত্র্য হারায়, বাসর-ঘরে দাস-খৎ লেখে। গানের ক্ষেত্রে, সুরের স্বাধীন বাক্-শক্তি অনেকটা খর্ব্ব হয়। কারণ, কথার আবেদন ও সুরের নিবেদনের মধ্যে একটা দোটানা বিরোধের ভাব থেকেই যায়;—সুর নিয়ে যেতে চায়, নিছক্ ভাব-রাজ্যের দিকে,—কথা নিয়ে যেতে চায় নিছক্ চিন্তা রাজ্যের দিকে। কথার দৌরাত্ম্যে সুরের অন্তরাত্মা পীড়িত হয়। Intellectual concept, emotive conceptকে লাগাম দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়। হিন্দী-সঙ্গীতে, যেখানে কথার দৌরাত্ম্য অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও অল্প, সেখানে সুরের, আপনাকে বিস্তার কর্ব্বার, পাখা মেলে ওড়বার কতকটা সুযোগ স্বাধীনতা ও অবকাশ আছে। লতা-মঞ্চের হিল্লোলিত সৌন্দর্য্যের প্রকাশে, তাহার ভিতরের কঞ্চির 'কাঠাম' একটা উপলক্ষ মাত্র। যেটাকে অবলম্বন করে, লতা তার হরিৎ-বর্ণের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, তার চঞ্চল-জীবনের ছন্দ নিয়ে, বাতাসে হেলে দুলে, আরোহণ ও অবরোহণের কাকলীতে আত্মপ্রকাশ করে, সেই ক্ষীণ অবলম্বনটি লতা-মঞ্চের সবুজসঙ্গীতের মুখ্য অংশ নহে, লতা-গুচ্ছের বিস্তারিত সবুজ-সুরের নিবিড় অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপনেই, মঞ্চের ক্ষীণ-যষ্টির সার্থকতা। কঞ্চির স্বতঃ প্রকাশের ইতিহাস ও আত্ম-জীবনীই যদি আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়, তা'লে বাঁশ ঝাড়ের উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল স্তম্ভ-শ্রেণীর বিরাট প্রাচুর্য্যের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান কর্ব্ব, লতাসুন্দরীর সবুজ-সুরের রহস্যের রাগিণীর অপমান করে, তার পত্র-গুচ্ছের অবগুণ্ঠন অপসারিত করে,—কঞ্চির ক্ষীণ দেহকে বড় করে দেখ্‌ব না। কথার 'কথাই' যদি শুনতে চাই, তবে কবিতার শব্দ-মালার দ্বারস্থ হব, সুর-লহরীর ভাব-সমুদ্রে ডুবে মরি কেন? আর সুরের 'কথাই' যদি শুনতে চাই, তাহলে কথার 'কথা' বন্ধ কর্ত্তে হবে। কারণ অভিধানের শব্দমালা স্তব্ধ না হলে, সুরের স্বতন্ত্র বাক্-শক্তি মুখরিত হয়ে উঠবে না। স্বরালাপে, যন্ত্র-সঙ্গীতে, "তেলেনা" গানে, সুরের স্বতন্ত্র বাক্-শক্তির পরিচয় আমরা পাই। এখানে কথার খাদ নাই, খাঁটী সুরের নিছক সুরের আবেদন। এই সুরের পীঠে চড়ে, আমাদের অতি পরিচিত মাটী-মাড়ান পৃথিবী ছেড়ে, অনেক উচ্চে, এক অলৌকিক ভাব-রাজ্যে আমরা উড়ে যাই;—এ রাজ্যে, 'কথা'র গতিবিধি নাই, সুরই হচ্ছে একমাত্র বাহন।

বাঙ্গলা গানে, বিশেষতঃ রৈবিক সঙ্গীতে, যেখানে কথার অনেক 'কথা' বলবার আছে, সেখানে আভিধানিক শব্দের ব্যঞ্জনা সুরের ব্যঞ্জনাকে স্তব্ধ করে, কথার চাপে, সুরের বিকাশ, সুরের বিস্তার আপনাআপনি ক্ষুব্ধ হয়ে আসে। যাঁরা কথাবাদী যাঁরা সুরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না, তাঁরা বলবেন, সুরের আবার আপনার কথা বলবার কি আছে, কথাকে উজ্জ্বল করা, রঞ্জিত করাই হল সুরের ধর্ম্ম, কথার 'কথাটা' চিত্তহারী রূপে, "স্বর"-বর্ণে, প্রকাশ করাতেই সুরের সার্থকতা। সুরের স্বাতন্ত্র্য-বাদীরা বলবেন, সুরেরও নিজস্ব 'কথা' আছে, কথার 'কথা' স্তব্ধ হলেই সেটা শোনা যায়, কথার কচকচিতে, সেটা মারা যায়। দীনবন্ধুর নিমে দত্ত ঠিক বলেছিল, স্বরালাপের নিরর্থক 'তোম্ তেনেনা' ইত্যাদি অর্থহীন শব্দের "কোনও মানে হয় না, কিন্তু বড় মজা হয়"। সুরের দরদীরাই এর "মজা" উপভোগ করেন, কথার দরদীরা সুরের অপরিচিত "ভাষার" ব্যবধানে, বাহিরে দাঁড়িয়ে, শিশুদের সঙ্গে একজোট হয়ে, হাসি মিসিয়ে, উপহাস করেন। এই 'মজা'টা কি, তাহা কথার ভাষায় অনুবাদ করা যায় না, তাহা যদি সম্ভব হত, তা হলে, সুরের রাজ্যে বিচরণ করবার কোনও সার্থকতা বা সফলতা থাকত না। সুরের স্বারাজ্য সেইখানেই সমাধি-লাভ কর্ত্ত। Cubist চিত্র-শিল্পীরা দৃশ্য-জগতের পরিচিত রূপের হাড়-গুড়া করিয়া, নিছক-রূপের ছন্দ রচনা করিয়া, ঐ একই 'মজা' উপভোগ করেন। এই 'মানে-হয় না,' নিরর্থক রেখার আবেগ-ময় নক্সাবাজী (dynamic draughtsmanship) বা সুরের মজাদার স্বর-রচনা (significant note-compositions) নূতন ভাব-রসের সৃষ্টি করে, অভিনব অলৌকিক অধ্যাত্ম-রসের আস্বাদন দেয়, আমাদের অতি-পরিচিত, চোখে-দেখা ও কানে শোনার জগৎ হইতে আমাদের মুক্তি দেয়। সুরের স্বতন্ত্র সুরলোকে আমাদের নূতন উপনিবেশের বাসা বাঁধে। যারা সুরের রাজ্যে বাসা বাঁধে, তারা কথার রাজ্যে ফিরতে চায় না। তাহারা নূতন অমৃতের সন্ধান পায়, কথার অমৃত, কবিতার মৃত-সঞ্জীবনী তাহাদের নিকট নগণ্য, তুচ্ছ, অর্থহীন।

কলঙ্কের কালিমা

—গল্প—

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ না হলেও এই শতাব্দীর সভ্যতাকে বড় ভালবাসি। চোখ রাঙ্গাতে হয় না, ঘুষো পাকাতে হয় না, লাঠি তুলতে হয় না। জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলো অবাধে নিষ্পত্তি হয়ে যায় উকীল-বাড়ীতে। ভবযাত্রার গণ্ডী পার হওয়ার দরকারই পড়ে না। সুবিধা সব রকমেই। কিন্তু তবু, কি জানি কেন, মনটা কেমন সময় সময় হাঁপিয়ে ওঠে। তখন পালাই, বহু দূরে পালাই। কোথাও একটা কল্পিত অর্দ্ধ বর্ব্বর আবেষ্টনের মাঝে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বাঁচি। পাঠকও চলুন আজ আমার সঙ্গে, ছাতি ভ'রে খানিকটা খোলা হাওয়া খেয়ে আসবেন।

অনেক বছর আগে আমার এক চারণ বন্ধু ছিল। উদয়পুর থেকে তাকে আনিয়েছিলাম। প্রায় সাত মাস সে আমার সঙ্গে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরেছিল। কখন একা একাই সন্ধ্যাবেলা ব'সে তার গান শুনতাম। কখনও বা আশে-পাশের গ্রামবাসী রাজপুত তালুকদারদের নিমন্ত্রণ করতাম। যত বড় মজলিশ জমত, বারোটাজী গাইতও তত ভাল। চাঁদকবি-প্রমুখ প্রাচীন চারণদের গাথা তার সমস্তই মুখস্থ ছিল। জলসা আরম্ভও করত কতকগুলো বাঁধা পদ গেয়ে। কিন্তু দুই এক মাত্রা কুসুম্বাপানি সেবনের পর মুখ খুলে যেত তার। তখন কোন বাধাই থাকত না। মুখে মুখে অনর্গল শ্লোক রচনা ক'রে গেয়ে যাচ্ছে। গাইতে গাইতে কখন হাসছে, কখন কাঁদছে, কখনও বা বীররসের উদ্দীপনায় তার চোখ দুটো জলে উঠছে। আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মুখের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গীও ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। আমার রাজপুত অতিথিরা মন্ত্র-মুগ্ধ। তারাও চারণের সঙ্গে একবার হাসছে, একবার কাঁদছে, একবার বা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে। খোলা মাঠে মশালের আলোয় সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! জলসা সত্যি জমত রাত বারোটার পর। ততক্ষণে প্রধান পালাটা শেষ হয়ে যেত। বারোটজী একবার জিজ্ঞাসা করতেন, "আরও কিছু শুনবেন, মহারাজ?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই মনের আনন্দে নূতন পালা রচনা করতে লেগে যেতেন। এ সব পালাতে ইতিহাসের বালাই ছিল না। রাজওয়াড়ার কোন্ অখ্যাতনামা কিল্লেদারের জীবন-কাহিনী নিয়ে চারণ মহারাজ এমন গান গল্প জুড়ে দিতেন যে আমাদের ঘুম কোথায় পালিয়ে যেত। একদিনকার কথা মনে আছে। পালা ফুরিয়ে গেছে, রাত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গায়কের শ্রান্তি নেই। কুর্ণিশ কি, উঠন্ত সূর্য্যের দিকে ফিরে একটু হেসে গান ধরলেন:

"পূরব গগন ভাসিত করী উঠত সুরজ মহারাজ।"

কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পালাই না শুনেছি—এই শেষ রাত্রের জলসায়। তার একটা আজ আপনাদের বলি, যতদূর মনে আছে। বারোটজী বলতে লাগলেন:

শুন সভাজন, রাজপুতের শৌর্য্যবীর্য্য এখনও অন্তর্মিত হয় নেই। আজও প্রতিদিন হিন্দুস্থানে কত শত রাজপুত আপন ইজ্জৎ রক্ষার জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে। সে ইজ্জৎ কি সহজ জিনিস, ভাই! স্ত্রীলোকের সতীত্বের চেয়েও ভঙ্গুর জিনিস এই রাজপুতের ইজ্জৎ। অর্থ কিছু নয়, রাজ্য কিছু নয়, সিংহাসন কিছু নয়, প্রাণও কিছু নয়, যদি তার অমল ধবল কুল-গৌরবে কণামাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করে। মনে আছে, রাঠোরের মন্ত্রী একদিন তাঁর প্রভুকে মারবাড়ের তৃণহীন মরুপ্রদেশ দেখিয়ে সগর্ব্বে কি বলেছিলেন?

আকড়ার খোঁপ, বকরার পাল,
বাজরার রুটী, তুম্বরের ঝাল,
দেখ্ রে রাজা তোর মারবাড়।

মারবাড়ের রাঠোরদের কথা জান ত? তাদের গৌরবগাথা আমার কাছেই ত কত শুনেছ। এই কুলের এক ক্ষুদ্র সামন্ত

হরিসিং রাঠোর, মারাঠা রাজাদের সেনানী হয়ে, গুজরাতে আসেন। সে অনেক দিনের কথা। তখন তুর্কীর সূর্য্য চিরদিনের মত ডুবেছে, দিল্লীর তক্ত টলমল করছে, আর সেই তক্ত নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ইংরেজ ও মারাঠা। হরিসিংহের পৈত্রিক পেশা লড়াই। মারাঠাদের ফৌজে ঢুকলে প্রাণ ভ'রে লড়তে পাবে। আর, কে জানে, অদৃষ্টে থাকে গুজরাতের সুন্দর সবুজ বনানীর মাঝে এক নূতন রাঠোর রাজ্যের পত্তন করবে। ভাই সব, বীরের স্বপন ত এই রকমই হয়ে থাকে। কিন্তু হায়, স্বপন কি সত্য হয়! হরিসিং সাধ মিটিয়ে লড়লে, কিন্তু নূতন রাঠোর রাজ্য স্থাপন করা হল না। তবে তাঁর উপর তুষ্ট হয়ে গায়কবাড় মহারাজ মেহসানার কাছে এক জায়গীর ইনাম দিলেন। তারপর তুর্কী গেল, রাজপুত গেল, মারাঠা গেল, দিল্লীর তক্তে বসল ইংরেজ কোম্পানী। মরদের লড়াই খতম হয়ে গেল। আমলা, উকীল আর বেণেতে মিলে মেড়ার লড়াই জুড়ে দিলে। হরিসিং রাঠোরের বংশধররা আপন কোটে আফিঙ্গ খেয়ে ঘুম দিতে লাগল। এ নূতন রাজ্যে তাদের স্থান কোথায়? যাক্, এখন আপদ চুকে গেছে। আর হরিকোটে কেউ রাঠোর নেই। সেই বংশলোপের করুণ কাহিনীই আজ তোমাদের বলব। হরিসিংহের শেষ বংশধর রণবীরসিং যথার্থই শূর বীর ছিল, সার্থক তার জন্ম হয়েছিল রাঠোর কুলে। কিন্তু ভাই, আর ত রাজস্থানের ঝণ্ডা উড়বে না, আর ত তিরৌরী, হলদীঘাট, দেবীরে রাজপুত রণতাণ্ডবে মাতবে না। শৌর্য্য এখন মরদের অলঙ্কার নয়, চরণের নিগড়। তবু প্রদীপ নেভবার আগে একবার জলে উঠেছিল। কলঙ্কের কালিমা ধুয়ে ফেলবার জন্য আবার একবার রাঠোরের শমশের বীরের হাতে বিজলী খেলেছিল।

রণবীরকে আমি দেখেছিলাম যখন সে বারো বছরের ছেলে। সোনার মত রঙ্গ ছিল তার, কমলের মত মুখ। কিন্তু কি চোখ, ভাই, কি চোখ! যেন চৌদ্দপুরুষের সঞ্চিত আগুন সে চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে তার বাপ তাকে ইস্কুলে পড়তে দিলেন। কিন্তু সেই হাতে কলম ধরবে কি ক'রে? সেই চোখে পুঁথীই বা পড়বে কেমন ক'রে? কলম ভেঙ্গে, পুঁথী ছিঁড়ে সিংহের বাচ্চা দু'চার বছর কাটালে। তারপর বাপ মরে যেতেই সরস্বতী-মায়িকে প্রণাম ক'রে ইস্কুল থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলে। হরিসিংহের এক মিশকালো রঙ্গের প্রকাণ্ড কাঠিয়াবাড়ী ঘোড়া ছিল, নাম সুলতান। তার পিঠেই সারাদিন কাটাতে লাগল। খুড়ো জ্যাঠা কেউ ছিল না যে মানা করবে। কালীয়র হরিণের পেছনে বল্লম হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে, তার মৃগয়া হত। ছুটো বাজ পুষেছিল। তাদিকে হাতের উপর বসিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিল জলার কিনারে কিনারে ঘুরত। কিন্তু এ রকম ক'রে কত দিন কাটাবে জোয়ান ছেলে? শেষ, হায়রান হয়ে বেরিয়ে গেল রাজস্থান ভ্রমণে। দুটি বছর ধ'রে রাজোয়াড়ার প্রত্যেক কেল্লা, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক মন্দির, ঘুরে ঘুরে দেখলে। দেখত আর ভাবত, এই রাজপুতের রক্তে জন্মেছি আমি! বুকটা দশ হাত হয়ে উঠত। আবার তখনই মনে পড়ত, কই, আজ ত কিছুই নেই। কোথায় হিন্দু, কোথায় তার ক্ষত্রিয়, কোথায় রাজপুত! সব গেছে। যদি সবই গেছে ত বেঁচে ফল কি? একবার যদি তলোয়ারটা খুলে কোথাও লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়াতে পারতাম ত মরার মত মরতাম। যাই দেশ ছেড়ে। কোথায় লড়াই হচ্ছে খুঁজে বের করি। তারপর, বাপ দাদা যে রকম ক'রে জান দিয়েছেন, সেই রকম ক'রে দিই।

দেশে ফিরে রণবীরের আর হরিকোটে কিছুতেই মন বসল না। কাজ একটা তার চাই। এই বয়সে থালী হাতে ব'সে থাকবে কি ক'রে! গেল চ'লে বড়োদায় তার পিতৃসখা সরদার শম্ভাজীরাও মোহিতের কাছে। তাঁকে সব মনের কথা বললে। তিনি শুনে একটু হেসে বললেন, "বাবা, তুই বলিস্ ত ইংরেজী ফৌজে তোকে চেষ্টা ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সাধারণ সিপাহী হয়ে ঢুকতে হবে। তা পারবি কি?"

"রাও সাহেব, আমি খুব পারব। কিন্তু জাতের লোকে আমায় একঘরে করবে। জানেন ত, গরাসীয়া রাজপুতের কি রকম জাতের দেমাক!"

"তা জানি, রণবীর। বুঝতেও পারি। যার জাত আছে, বংশ আছে, তারই কুলগৌরব থাকে, কুলী মজুরের থাকে না।

আচ্ছা, তোকে যদি আমি আমাদের গায়কবাড়ী ফৌজে একটা সামান্য রকম হুদ্দেদার ক'রে দিই, তাহলে চলবে? কিন্তু তলোয়ার বাঁধবি এই পর্য্যন্ত, খুলতে হবে না কোন দিন।"

"তাই করে দিন, সরদার সাহেব। কে জানে তলোয়ার খোলার মৌকা হবে কি না কোন দিন! একটা বড় রকম লড়াই যদি বাধে, ত রাজওয়াড়ার ফৌজেরও হয় ত ডাক পড়বে। নসীবে থাকে হবে।"

"আচ্ছা রণবীর, আমি মহারাজকে বলব। তুমি তোমার জায়গীরের ব্যবস্থা ক'রে মাস খানেকের মধ্যে বড়োদায় আবার এসো।"

"জায়গীর ত বাবা ইজারা দিয়ে গেছেন। ঘরকন্নার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই আসছি। রাও সাহেব, আপনি আমায় বাঁচালেন। প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছিল।"

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ফৌজে দাখিল হওয়া রণবীরের অদৃষ্টে নেই; হবে কোথা থেকে! সে ত তা জানে না। ফেরবার পথে আহমদাবাদে নামল। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ভদ্রকালী মন্দিরে পূজা দিয়ে যাবে। ভদ্দরের ভদ্রকালী জাগ্রত দেবতা। তোমরা সবাই জান প্রতি বৎসর সন্ধি-পূজায় সেখানে মহিষ বলি দেওয়া হয়। জৈন, বৈষ্ণব, বণিকের শহরে কেল্লার মাঝখানে যে আজও বলি বন্ধ হয় নেই, সে শুধু দেবীর মাহাত্ম্যে। সেই মন্দিরের পূজারী ঠাকুর ছিলেন একজন সিদ্ধপুরুষ। বারো বার ভারতের সমস্ত পীঠস্থান পরিভ্রমণ ক'রে এসেছেন। তিনি পূজার পর রণবীরের কপালে রক্ত চন্দন দেওয়ার সময় বললেন, "বৎস, তুমি অবিলম্বে ক্ষত্রিয়ের কাম্যলোক প্রাপ্ত হইবে।"

মনের আনন্দে বালক হরিকোটে ফিরল। আর কাউকে কিছু না ব'লে সোজা চ'লে গেল আস্তাবলে। তার কালো ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললে, "সুলতান, লড়াইয়ে যাবি?" সুলতান চেঁ হেঁ হেঁ ক'রে লাফিয়ে উঠল। রণবীর হেসে তার গরদান চাপড়ে বললে, "আরে বেটা, একটু সবুর কর। অত অধীর হলে চলবে কেন?" ভাই সব, কে বেশী অধীর হয়েছিল, ঘোড়া না সওয়ার?

রণবীরের বাপের আমলের এক খাবাস ছিল, অমরসিং। সেও জাতে রাঠোর। তার পূর্ব্বপুরুষ এসেছিল মারবাড় থেকে ঠাকুর হরিসিংহের চাকর হয়ে। সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়ার পর রণবীর তাকে বললে, "অমরসিং ভাই, আমার বড়োদায় নোকরী হয়েছে।" "কি নোকরী ঠাকুর সাহেব, পলটনে ত?" "হ্যাঁ, ফৌজে আফসার হয়েছি।" "লড়াই করতে যাবে, দাদা? তা ত যাবেই। সে ত তোমাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু তোমার বংশের নিয়ম যে বিবাহ না ক'রে লড়াইয়ে যেতে নেই।" "বিবাহ কাকে করব? কিছুই ত ঠিক নেই।" "একটি খুব সুন্দরী কন্যা আছে, ঠাকুর সাহেব। বেশী দূরেও নয়। জেতপুরের বাঘেলা ঠাকুরের নাতনী। কিন্তু তাদের অনেক পয়সা। আমাদের ঘরে যদি মেয়ে দিতে রাজী না হয়? আর [illegible] নেই, হুজুর, যে কন্যা ধ'রে নিয়ে আসা চলবে।"

"কেন চলবে না? আলবাৎ চলবে। মেয়ে একবার দেখাতে পার? আমাদের ঘরে কেমন বিয়ে না দেয় দেখে নেব।"

"আচ্ছা ঠাকুর সাহেব। আমি কাল সকাল জেতপুর গিয়ে কথাটা পেড়ে আসি।"

সন্ধ্যাবেলা অমরসিং জেতপুর থেকে ফিরে এল। বিরস বদন। রণবীর জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলে, "না দাদা, সেখানে হল না। বাঘেলা ঠাকুর সাহেব কিছুতেই রাজী হয় না। একেবারে বেগে বনে গেছে। বললে, রাঠোর ফাঠোর আমি বুঝি না, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুনাফা না থাকলে আমি মেয়ে দেব না।"

মনিবের রাগে চোখ জলে উঠছে দেখে অমরসিং তাড়াতাড়ি বললে, "তাতে কি এসে যায়, ঠাকুর সাহেব। আমি কালই বেরিয়ে খুব ভাল মেয়ের সন্ধান ক'রে আসব।"

"না অমরসিং ভাই, যখন অতবড় কথা বলেছে জেতপুরওয়ালা, তখন আমি ঐ মেয়েই নিয়ে আসব। কিন্তু একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"দেখতে চাও? তাহলে কাল ভোর বেলা জেতপুরের মন্দিরের দোয়ারে দাঁড়িয়ে থেকো।"

"কি ক'রে জানলে তুমি, অমরসিং ভাই?"

"সে অনেক কথা। আমি যখন বুড়ার সঙ্গে কথা কইছি,

তোমার রূপগুণের বাখান করছি, তখন ভেতরের ঘরে চুড়ী নূপুরের আওয়াজ শুনলাম। সেদিকে আমি চাইতেই যে দাঁড়িয়েছিল স'রে গেল। কিন্তু যখন ফিরে আসছি, আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে কোটের খিড়কী দরজা খুলে একজন আধ-বয়সী স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে আমায় রামরাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার ঠাকুর সাহেব কি একটা মস্ত কালো ঘোড়া চ'ড়ে শিকার খেলে বেড়ান? আমি বললাম—তা ত রোজই করেন। তখন সেই স্ত্রীলোকটি খিড়কীর কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ বাইসাহেব, তিনিই বটে। ভেতর থেকে মধুর কণ্ঠে জবাব এল—আমরা কাল সূর্য্যোদয়ের আগে মহাকাল মন্দিরে পূজা দিতে যাব, না জমনা-বাই? স্ত্রীলোকটি মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে—তোমার ঠাকুর সাহেবও পূজা দিতে আসবেন ত? আমি কোন উত্তর দিলাম না। হুজুর, এসব আমাদের সেকালের কাহিনীর মত শোনাচ্ছে। কিন্তু এখন দিন কাল অন্য রকম হয়েছে।"

রণবীর প্রসন্নমুখে বললে, "কিছুই অন্যরকম হয় নেই। রাজপুত চিরদিনই রাজপুত। অমরসিং ভাই, যদি কনে পছন্দ হয় ত একা বাড়ী ফিরব না।"

অমরসিং হেসে উত্তর দিলে, "দাদা, পুরুত একটা ডাকতে কতক্ষণ লাগবে?"

পরদিন মহাকাল বাবার মন্দিরের বাহিরে শুভদৃষ্টি হল। চোখে চোখে কি কথা হল আর কেউ জানলে না। রণবীর সিং ঘোড়া থেকে নামে নেই। সে হাত বাড়াতেই রূপালী-বাই লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার উপর। সুলতান তিন লাফে বেরিয়ে গেল হরিকোটের রাস্তায়। অমরসিং পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে আর এক ঘোড়ায় বসেছিল। তার ভাবগতিক দেখে জেতপুরের দরোয়ান একটা কথা বলতেও সাহস পেলে না। জমনা-বাই একবার "কি হল, কি হল, চোর, চোর!" ক'রে নাটুকে ধরণে চেঁচিয়ে উঠল। অমরসিং একটু হেসে তার পায়ের কাছে দু থান গিনি মোহর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল। বাড়ীতে পুরুত উপস্থিত ছিল। পাড়া-পড়সী রাজপুত মেয়েপুরুষ সব এল। রূপালী-বাই যথাবিধি হরিকোটের সরদারণীর পদে বহাল হলেন।

অমরসিং সেই দিন হতে হস্তাখানেক হরিকোটের চারদিকে তিরিশজন জোয়ান পাহারায় মোতায়েন রাখলে। আট দিনের দিন জেতপুর হতে সওয়ার এল ঠাকুর সাহেবের চিঠি নিয়ে। চিঠি রূপালীর নামে।

"রূপালী-বাই, তুমি স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় ছেড়ে গেছ। আর কখনও আমার কেল্লায় ঢুকতে চেষ্টা কোরো না। দরওয়ানরা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবে। তাদের উপর কড়া হুকুম আছে। আর এক কথা। হরিকোটে পাহারা মিছেমিছি কেন রেখেছ? আমি তোমায় কেড়ে আনতে ইচ্ছা করলে তোমার ভিখারী বর আমায় আটকাতে পারবে না। তবে, আমি আর তোমায় নিয়ে কি করব?

রাঠোর ছ'াড়াটাকে বিয়ে করেছ ত?

ঠাকুর জয়সিংজী বাঘেলা।"

রূপালী চিঠিখানা প'ড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। স্বামীকে দেখালে না। এক কলম জবাব তখনই লিখে দিলে।

"জেতপুরের ঠাকুর সাহেব জয়সিংজী বাঘেলা সমীপেষু:

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি বিচলিত হবেন না। ভিখারী স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে 'আপনার জেতপুরের কেল্লায় ফিরে যাওয়ার আমার কোন ইচ্ছাই নেই। দরওয়ানদের ব'লে দেবেন।

হরিকোটের রূপালী-বাই রাঠোর।"

আরও একমাস দেখতে দেখতে চ'লে গেল। রূপালী ও রণবীর দুজনেই ভুলে গেছে যে তারা মর্ত্ত্যলোকে বাস করছে। একটা গোলাপী নেশায় তাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। সংসারের সমস্ত ভার অমরসিং মাথায় করে রয়েছে। "আহা! ছেলেমানুষ, দুদিন আমোদ ক'রে নিক্। দুনিয়াদারী ত আছেই। সারা জীবন দুনিয়াদারীতে ডুবে থাকতে হবে।" যেখান থেকে পারে, বুড়ো রোজ সকালে এক রাশ ফুল এনে ঢেলে দেয় এদের সাথনে। দুজনে সেই ফুল নিয়ে কত খেলাই করে! কখন বা বেল ফুলের মালা গেঁথে দুজনে দুজনার মাথায় গলায় গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে, কখন বা গাঁদাফুল ছিঁড়ে নিয়ে দুজনে দৌড়াদৌড়ি, মারামারি, ছোড়াছুড়ি করছে, কখন বা রণবীরের তলোয়ারখানাকে খাপ থেকে বের

ক'রে রূপালী গোলাপফুল দিয়ে সাজাচ্ছে। একদিন রণবীর হেসে বললে, "রূপালী, আমাকে ফুল দিয়ে বেঁধে তোর সাধ মিটল না, তলোয়ারখানাকেও ফুল পরাচ্ছিস্!"

বালিকা উত্তর দিলে, "সিংহজী, সময় এলে দুজনকেই রক্তচন্দনে সাজিয়ে দেব। কিন্তু আমার ফুলের খেলা যে এখনও শেষ হয় নেই, এস, আজ সুলতানকেও মালা পরিয়ে দিয়ে আসি।"

সুলতানের নাম শুনে রণবীরের বড় লজ্জা হল। সেই যে মহাকাল মন্দির থেকে ফিরে এসেছে, তার পর আর একবারও সুলতানকে বের করে নেই। ছি, ছি, ছি, রাজপুতের ছেলে না সে! ঘোড়াকে এই রকম হেনস্তা করছে! রূপালী কিন্তু রোজ একবার আস্তাবলে যেতে ভোলে না। গিয়ে সুলতানকে গলা জড়িয়ে কত আদর করে, তেল চিরুণী দিয়ে তার চুল আঁচড়ে দেয়, আটা গুড় মশলা দিয়ে লাড্ডু ক'রে খাইয়ে দেয়। রণবীরের কিন্তু বড় লজ্জা করছে ঘোড়ার সামনে যেতে। কে জানে, হয় ত সুলতান মনে করে, "কি নিমকহারাম আমার মনিব! ওর রূপালীকে এনে দিলে কে? এখন তাকে নিয়ে মশগুল, একবার আমার দিকে ফিরেও চায় না।"

আজ কিন্তু স্ত্রী ছাড়লে না। দুজনে আস্তাবলে গেল। প্রভুকে দেখে ঘোড়া মহা আনন্দে লাফ দিয়ে চেঁ হেঁ ক'রে উঠল। রূপালী তাকে এক চড় মেরে বললে, "পাজী ঘোড়া! কোথায় ছিল তোর মনিব এত দিন? আমায় দেখে ত এ রকম লাফালাফি করিস্ না!"

সুলতান যেন বুঝতে পারলে তার কথা। আদর ক'রে তার ছোট্ট কাঁধটির উপর মাথা রেখে সামনের ডান পাটা তুলে দিলে রণবীরের হাতে। অমরসিং দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। এক গাল হেসে বললে, "আহা হা, কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোমাদের তিন জনকে, বাই সাহেব!"

এমন সময় ডাক হরকরা এক চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানা হাতে ক'রেই অমরসিংহের সমস্ত গা-টা কেঁপে উঠল। বৃদ্ধ ভাবলে, "এ রকম কেন হল? কোথাকার চিঠি এ?" রণবীর চিঠি নিয়ে বাড়ীর দিকে চ'লে গেল। "কার চিঠি, সিংহজী?" বলতে বলতে রূপালী তার পিছু পিছু চলল। চিঠি প'ড়ে রণবীর একটুক্ষণ বোকার মত ব'সে রইল। তার পর চিঠি রূপালীকে পড়তে দিলে। ম্লান হাসি হেসে বললে, "রাজপুতানী, শেষ হয়ে গেল তোর ফুলের খেলা।"

চিঠিখানা এই:—"রণবীর সিংহজী, এক মাস ত হয়ে গেছে, কই তুমি এলে না? আমি মহারাজ বাহাদুরকে ব'লে চাকরী একেবারে পাকা ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে জেতপুরের ঠাকুর সাহেব এখানে এসেছিলেন। তিনি দেওয়ান সাহেবের কাছে তোমার নামে কি সব নালিশ করে গেছেন। তুমি অবিলম্বে বড়োদায় আসবে। ভয় নেই, আমি তোমার চাকরীর কোন গোলযোগ হতে দেব না। কিন্তু তোমার এখনই এখানে আসা দরকার। আশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—শম্ভাজীরাও মোহিতে।"

রূপালী চিঠি প'ড়ে একবার জোরে নিশ্বাস নিলে। তার পর হাসতে হাসতে স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললে, "তা সিংহজী, তুমি কি করবে বল? সেপাই মানুষের বৌ, চিরদিন ফুলের খেলা চলবে না জানতাম। কালই বড়োদা চ'লে যাও তুমি তাহলে।"

"তা যাব! কিন্তু তোকে কোথায় রেখে যাই?"

"আমাকে আবার কোথায় রেখে যাবে? আমি আমার নিজের কেল্লা আগলাব।" অমরসিং এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পারব না কেল্লা আগলাতে, অমরসিং ভাই?"

অমরসিংহের বুকটা গর্ব্বে ভরে উঠল। বললে, "কেন পারবে না, বাই সাহেব! এমন বৌ আমরা ঘরেই আনি না। তুমি একটুও ভেবো না, মা! ঠাকুর সাহেব ত সত্যি-লড়াই করতে যাচ্ছেন না। মরাঠা রাজার মহল আগলাতে যাচ্ছেন, ছিঁচকে চোর ভেতরে না সেঁধোয়।"

রূপালী হেসে উঠল,—কিন্তু রণবীর গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলে, "না অমরসিংহজী, বাই সাহেবকে এখানে রেখে যাওয়া চলবে না। কাছেই প্রবল শত্রু রয়েছে, জেতপুরের ঠাকুর সাহেব। রূপালী, চল্ তোকে আহমদাবাদে তোর মামার

বাড়ীতে রেখে যাই। ছুটী পেলে বাড়ী এসে একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রে যাব।

রূপালী তখনও হাসছে। বললে, "সিংহজী, তুমি এত বড় রাঠোর বীর, আমার জন্য তোমার এত ভয় কেন বল ত!" রণবীর সে কথার উত্তর না দিয়ে অনুচরকে বললে, "অমরসিং ভাই, তুমি আজই আহমদাবাদ চলে যাও। ওঁদের বোলো রূপালী কাল আসছে।"

পরদিন যখন স্বামী স্ত্রী ষ্টেশনে পৌছল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। ডুলী বেয়ারা, ঘোড়া, চাকর বাকর, সব বিদায় ক'রে দিয়ে দুজনে প্লাটফরমে উঠল। টিকিট কেনবার সময় জিজ্ঞাসা করলে, "আহমদাবাদের গাড়ী কখন আসবে, মাষ্টার বাবু?" "এগারটা রাত্রে।" "এত রাত্রে কেন? সাড়ে সাতটায় যে একটা গাড়ী ছিল।" "ছিল বটে। কিন্তু এই পয়লা তারিখ থেকে সেটা সাড়ে ছ'টায় আসছে। এই একটু আগেই ছাড়িয়ে গেল। তোমরা বস গিয়ে বাহিরে। আমার গল্প করার সময় নেই, অনেক কাজ।"

রূপালী আপাদমস্তক একটা বুটিদার চাদর ঢেকে দোরের বাহিরে দাঁড়িয়েছিল। এগারটা অবধি ষ্টেশনে ব'সে থাকতে হবে শুনে মনে কেমন ভয় হচ্ছিল তার। অজানা অকারণ ভয়। ব্যস্ত হয়ে দোর গোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। ব্যস্ততার জন্য মুখের কাপড়টা স'রে গেছল। সেই ফুটন্ত কমলের মত মুখখানির উপর নজর পড়তেই মাষ্টার বাবুর সমস্ত ভাবটা বদলে গেল। এক গাল হেসে গদ্‌গদভাবে রণবীরকে বললে, "আসুন আমার সঙ্গে, ঠাকুর সাহেব। আমি আপনাদের বসবার ভাল জায়গা ক'রে দিচ্ছি। কোন কষ্ট হবে না।" দুজনকে নিয়ে গিয়ে বসালে Ladie's Waiting Room-এ, মহিলাদের বিশ্রাম ঘরে। পরিষ্কার সাজান ঘর। টেবিলে ল্যাম্প জলছে। একজন আধবুড়ো কুলীকে ডেকে বললে, "এই পোর্টার! দোরের কাছে থাকিস। এঁদের কিছু দরকার হলে সাহায্য করবি।"

ছোট ষ্টেশন। ট্রেন চলে গেলেই নিঝুম হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী এক বেঞ্চে ব'সে ঢুলতে লাগল। খানিক পরে রণবীর বললে, "রূপালী, এ রকম ক'রে দুজনে ঘুমোলে কি হবে? বাড়ী পৌছে যেতে ত একটা বাজবে। তুই যদি একটু একা থাকতে পারিস্ ত ঝট্ ক'রে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসি।" রূপালীর স্বামীর পাশে বসে বসে তখন ভয়টা কেটে গেছে। বললে, "সে ত খুব ভাল কথা। দুজনে খেয়ে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, আমার একলা থাকাতে তোমার এত ভয় কেন বল ত! হরিকোটে একলা থাকতে পারব না! এখানে সরকারী ষ্টেশনে দু দণ্ড একলা বসতে পারব না! আমিও ত রাজপুতের মেয়ে!"

রণবীর নির্ভাবনায় বেরিয়ে গেল। মনে করলে, "কতই বা দেরী হবে? আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না। পোর্টারটা ত বসে রয়েছে দোর গোড়ায়।" কিন্তু শীঘ্রগীর ফিরতে পারলে না। খাবার কেনাত সহজেই হল। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই দেখে, দুজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বেজায় কাঁদা-কাটা করছে। রণবীরের বগলে তলোয়ার দেখে তাকে সরকারী লোক ঠাওরালে। এসে একেবারে পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "আমাদের দিয়ে তিন কোশ মাল বওয়ালে, হুজুর। এখন চার আনা বই পয়সা দিচ্ছে না।" "কে পয়সা দিচ্ছে না?" "ঐ গলীর মহাজনরা। দয়া ক'রে ওদের একটু ধমকে দাও, বাবা।" "আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।" গলীতে গিয়ে রণবীর খুব তম্বিতম্বা করলে। শেঠরাও ভাবলে সে সরকারী আমলা! অনেক দর কষাকষি ক'রে শেষ এক এক গাড়োয়ানকে বারো আনা করে দিলে।

রণবীর ষ্টেশনে ফিরে দেখে ওয়েটিং রুম অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে গেল। দেখলে এক কোণে রূপালী দেওয়াল ঠেস দিয়ে ভূঁইয়ে ব'সে রয়েছে। মুখ অবধি চাদর জড়ান।

হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি গো, ঘুমিয়ে পড়লি না কি?" কোন উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলে, "রূপালী, ঘুমোচ্ছিস্?"

কি রকম একটা ভয়ানক সুরে জবাব এল, "না জেগেই আছি। তুমি আমায় ছুঁইও না।"

রণবীর কিছু বুঝতে পারলে না। বললে, "কি বলছিস্ তুই, পাগলী! ওঠ, মুখে জল দিয়ে আয়। খাবার এনেছি।"

রূপালী আবার কথা কইলে, চাদরের ভেতর থেকে। ভাঙ্গা গলায়, হাঁপাতে হাঁপাতে, যেন যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছে, "না গো, না। পায়ে পড়ি তোমার, তুমি যাও, আমি খাব না। তুমি চ'লে যাও বড়োদায়। আমি হরিকোটে ফিরে যাচ্ছি এখনই। আমার কাছে দাঁড়িও না। দয়া কর।"

রণবীরের বুকের ভেতর যেন কে হাতুড়ী মারছে। জিব শুকিয়ে যাচ্ছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। খুব চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, রূপালী? বল্ আমাকে লক্ষ্মীটি। বল্, কি হয়েছে।" কোন উত্তর নেই।

তখন রণবীর বাহিরে প্লাটফরমে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কি করবে সে? কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় খানিক দূরে দেখতে পেলে সেই বুড়ো কুলীটাকে। তাকে দেখে পালাতে চেষ্টা করছে। একছুটে গিয়ে তার হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, "দরজা ছেড়ে কেন গেছলি তুই? কি হয়েছে আমার স্ত্রীর? কি হয়েছে বল্ হতভাগা।" ব'লে কুলীটার হাতে মোচড় দিতে আরম্ভ করলে।

বুড়ো যাতনায় গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, "আমায় কেন মারছ, ঠাকুর সাহেব? আমি বুড়ো, আমি গরীব, আমি গোলাম, হুকুম তামিল না কল্লে আমার গতি ছিল না।"

"স্পষ্ট বল্ কি হয়েছিল নইলে তোর হাতের কব্জী গুঁড়ো ক'রে দেব।"

ষ্টেশন মাষ্টারবাবু আলো নিভিয়ে আমায় হুকুম করলেন বাইকে ধরতে। বাই তখন ঘুমোচ্ছিল। আমি ধরলাম তাকে চেপে। ভয়ে, বাবা ভয়! মনে করলাম—চাকরী গেলে—বুড়ো বয়সে খেতে পাব না। দোহাই বাবা, গরীবকে প্রাণে মেরো না।"

"না তোর প্রাণ নেব না। ডান হাত বাড়া।" কুলীটা ডান হাত বাড়িয়ে দিলে। রাজপুত তলোয়ারের এক কোপে হাতখানা কেটে নিলে। নিয়ে ঝড়ের বেগে টিকিট ঘরে ঢুকল। সেখানে টেবিলের পেছনে বসে বাবু হিসেব লিখছিলেন। হঠাৎ দরজায় রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে রাজপুতকে দেখে ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেল। তবু জোর ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললে, "কে তুই? বেরো এখান থেকে। বেরো। নাতলামি করবার আর জায়গা পাস্ নেই! এটা সরকারী আপিস্, জানিস্ না। এখনই পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।"

রণবীর কথা কইলে না। এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে সেই কাটা হাতখানা দিয়ে বাবুর গালে এক ভীষণ চড় মার্‌লে। তার পর—লাল তলোয়ারখানা স্ফোস্ করে লাফিয়ে উঠল, গোখরো সাপের মত। বাবুর কাটামুণ্ড ভূঁইয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

চুলের মুঠি ধ'রে সেই মুণ্ড তুলে নিলে রণবীর। নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ফিরে গেল ওয়েটিং রুমে। স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "রূপালী, এই ত?" একটা দেশলাই জ্বেলে মুণ্ডটার সামনে ধরলে। রূপালী ঘোমটা তুলে দেখলে। দেখে ঘাড় নেড়ে জানালে, এই বটে। তারপর টেনে চাদরটা খুলে ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ধীরে ধীরে গরদান বাড়িয়ে দিলে স্বামীর দিকে। রণবীরের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তলোয়ারখানা হাত থেকে খ'সে পড়ল ঝনঝন ক'রে পাথরের মেজের উপর।

মুহূর্ত্তেক সে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বাহিরে লোকের কলরব বেড়ে উঠতে লাগল। মনে হল, কারা যেন সব দৌড়ে আসছে সেই দিকে। আর সময় নেই। রণবীর তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে রূপালীর কানের কাছে বললে, "আচ্ছা সেই ভাল, রূপালী। পিয়ারী, সেই ভাল। তুই এগিয়ে যা। আমিও আসছি।"

উড়ল তলোয়ার আবার, সেই আঁধার ঘর আলো ক'রে। সতীর রক্তে পৃথিবী পবিত্র হল। রণবীর স্ত্রীর ছিন্নমুণ্ড বুকে চেপে ধ'রে বাহিরে গিয়ে বসল। আধ ঘণ্টা পরে যখন পুলিশের দারোগা এলেন, তখনও সে সেই একই অবস্থায় ব'সে আছে, বিড়বিড় ক'রে কি বলছে। দারোগা একটা প্রশ্নেরও জবাব পেলেন না।

তার পর দশ বছর কাটল রণবীরের রত্নাগিরির পাগলা গারদে। কাউকে কষ্ট দিত না এতটুকু। চুপ চাপ ব'সে থাকত একটা ইঁট কি এক চাঙ্গড়া মাটি কোলে ক'রে।

চোখ থেকে টস্ টস্ ক'রে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ত সেই ইঁটের উপর কি মাটির ঢেলার উপর। দশ বছর এই রকম চলল। কত জলই না ছিল ভাই, তার চোখে। শেষ একদিন হল কি, হঠাৎ তার পাগলামি বেড়ে গেল। বাগানে পড়ে ছিল এক শাবল। দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে ভাঁজতে আরম্ভ করে দিলে যেন সেটা তলোয়ার। বিকট হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কোথায় আপিস? কোথায় সেই হারামজাদা মাষ্টার? একটু সবুর কর, পিয়ারী। আনলাম বলে তার মুণ্ড।" চার পাঁচজন ওয়ার্ডার তাকে তাড়া করলে। সে এক মই বেয়ে হুড় হুড় ক'রে পাঁচিলের মাথায় চ'ড়ে গেল।

তারপর শাবলটা নীচে ফেলে দিয়ে আকাশ পানে চেয়ে ডাক ছাড়লে, "রূপালী! রূপালী! আমি এসেছি।" কি দেখলে কে জানে। মুখে তার সুন্দর হাসি ফুটল। দু হাত বাড়িয়ে এক লাফ মারলে বাহিরের দিকে।

হরিকোটের রাঠোর-ঘরানা নির্ম্মূল হয়ে গেল। ভাই সব, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না আমার রণবীরের জন্য।

"চন্দন লেখা দ্বারে দ্বারে
চন্দনমালা দুলিছে বায়ে।"

চন্দন-সাবান

সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দন, সকল শুভ-কার্য্যের ও পবিত্রতার অঙ্গ। অতি পুরাতন হইলেও ইহা চিরনূতন। চন্দনের অবিকল গন্ধ ও রং আমাদের সাবানে প্রতিফলিত

—আমাদের সাবান—
ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস
কলিকাতা।

ওথেলো

—গল্প—

বুদ্ধদেব বসু

আশ্চর্য্য, এমিলিয়ার জীবনে যে প্রেম আসবে—তার বয়েস তখন উনত্রিশ, জীবন সম্বন্ধে যখন সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে, যখন সে প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে যে রঙদার একটু তুচ্ছতা ছাড়া জীবনের আর কিছুই দেবার নেই। যখন তার চাইতে বয়েসে দশ থেকে চার বছরের ছোট মেয়েরা এরই মধ্যে তার দিকে একটু করুণার দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছে।

কেননা, সে প্রায় সেই অবস্থায় এসে পৌঁচেছিলো যখন একজন মেয়ে বিবাহিতব্যতার শেষ সীমা অতিক্রম করে' যায়। তার রঙ্ ফিকে হ'য়ে আসছিলো। শিগগিরই সে একটা স্মৃতিতে পরিণত হবে। এককালে সে ছিলো আগুন। যুবকরা তার জন্য মরতে চেয়েছে। সুন্দরী বলে' তার খ্যাতি ছিলো—কিন্তু নিছক সুন্দরী বলে' নয়। সবাই মুগ্ধ হ'তো তার নিখুঁত রুচিতে, তার বুদ্ধিতে, তার ভঙ্গীতে—সব জড়িয়ে একটি স্তূপরূপ ব্যক্তিত্বে। সৌন্দর্য্যের অর্থ ছাড়াও তার মধ্যে রূপ ছিলো। ব্যবহারের নৈতিকতা ছাড়াও তার মধ্যে চরিত্র ছিলো। এবং মেয়েদের মধ্যে তা বিরল।

আর পুরুষরা আসতো ভিড় করে'। তারা বেশির ভাগ তার সমাজের—যেটা খুব ছোট, পিরামিডের সঙ্কীর্ণ চূড়ো। বাইরে থেকে ধূমকেতুর মত মাঝে-মাঝে ছিটকে পড়তো দু'একজন—কোনো সরকারি চাকুরে, রাজনীতি জগতের কোনো বীর, কোনো দরিদ্র সাহিত্যিক। প্রবল ছিলো তার আকর্ষণ। যে-বাতাস সে গ্রহণ করছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে, সেই বাতাসকে তারা ভালোবাসতো। বছর দশেক আগে তাকে উদ্দেশ্য করে' বাঙলা ভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা লেখা হয়। সত্যি বলতে, সে সেই কবিকে যশ এনে দিয়েছিলো। কিন্তু কবি বেশিদিন সে-যশ ভোগ করতে পারে নি; অল্পকাল পরেই একটা হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। অনেকদিন থেকেই সে ভুগছিলো ক্ষয়রোগে।

আর এখন—এখন যুবকরা তাকে প্রায় সম্মান করে' কথা বলে। আড়ালে আলোচনা করে তার অতীত নিয়ে। প্রত্যক্ষে করে অতিরঞ্জিত স্তুতি। তার এতটুকু কোনো কাজে লাগতে পারলে খুসি হয়। সত্যি খুসি হয়। যে-খেলা তারা সবে আরম্ভ করতে যাচ্ছে, তা তার কাছে জীর্ণ, এই চিন্তা তাকে খানিকটা মহিমা দিতো—সেই যুবকদের চোখে। তারা যে-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমিলিয়া সেখানে দেবীর মত।

তবু—সেইজন্যই—তারা আলগোছে থাকতো। শূন্য হ'য়ে আসছে চারদিক। এমিলিয়া অনুভব করতে আরম্ভ করলে' যে জীবনের উপর তার মুঠি শিথিল হ'য়ে আসছে। এক-এক সময় ভয়ানক নিঃসঙ্গ মনে হতো নিজকে। শেষ হ'য়ে এলো, মনে হচ্ছে। পুরুষের জগত, অন্তত। পুরুষের বস্তুর জগত। এখন আর কেউ তার প্রেমে পড়লে এটা প্রায় অভাবনীয়। কৌতূহলে প্রেমের উন্মেষ; প্রেমের রাজধানী রহস্যে। আর তার সম্বন্ধে সবাই বড় বেশি জানতো। তার হাতের তাস যেন সবাই দেখে ফেলেছে। কোনো পুরুষ যখন তার কাছে এসে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে নিজের কোনো তুচ্ছ প্রণয়ের গল্প বলতো, হঠাৎ তার যেন মনে হতো সে দেউলে হ'য়ে গেছে।

প্রেমে সে অবিশ্যি কয়েকবার পড়েছিলো। না পড়ে' উপায় কী? জীবনে এমন একা লাগে। প্রেমে সে সুখীও হয়েছিলো—অন্তত তখন তা-ই মনে হয়েছিলো। নিজকে সে দিয়েছিলো অকৃপণভাবে! ঝলমল্ করে' জ্বলেছিলো আগুন—হঠাৎ একদিন নিবেও গিয়েছিলো। কে জানে কখন, কে অত হিসেব রাখে। কিন্তু এমিলিয়া প্রতিবার প্রথম থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলো যে এটা শেষ হবারই জন্যে। তাতে সে আপশোষ করে নি—বরং খুসিই হয়েছিলো। আ, প্রেম পর্য্যন্ত সাধারণ। শেষ পর্য্যন্ত, তার মনে কোনো ছাপ রেখে

যায় নি কোনোটাই। কোনোটারই মানে হয় না তার কাছে। প্রেম অর্থহীন।

আর তার নিঃসঙ্গতা জমে উঠতে লাগলো নিবিড় হ'য়ে। মাঝে-মাঝে সে অত্যন্ত অসুখী হ'তে পারতো যদি না সে জানতো যে জীবন অসুখী হবারও উপযুক্ত নয়। কী হবে মন-খারাপ করে'? কী হবে ভেবে? যেতে দাও, হ'তে দাও। কিন্তু এমন একা।

আর এই সময়েই ভাস্কর রায়ের সঙ্গে তার দেখা। প্রথম তাদের দেখা হয় গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক নাচের রাত্তিরে। মিসেস্ চম্‌লি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলাপ হবার আগেই এমিলিয়া তাকে লক্ষ্য করেছিলো। তাদের চোখ মিলেছিলো; সেই দীর্ঘ কৃশকায় মূর্ত্তি তাকে আকর্ষণ করেছিলো চুম্বকের মত। অলক্ষ্য বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত দু'জনের মধ্যে—এই আকর্ষণ।

মিসেস্ চম্‌লি তাদেরকে একা ফেলে নাচের জন্য উঠে গেলেন। কোণের একটা টেবিলে বসে' শ্যাম্পেনে একটু-একটু চুমক দিতে-দিতে তারা আলাপ করেছিলো। ইটালি। দু'জনের মধ্যে ঐ একটা মস্ত মিল পাওয়া গেলো—ইটালি। ভাস্কর বারো বছর ইয়োরোপে কাটিয়ে এই দেশে ফিরছে। বেশির ভাগ সময় সে ইটালিতে ছিলো। সে ছবি আঁকে, ইটালি তার তীর্থ। আর এমিলিয়ার জন্ম হয়েছিলো ইটালিতে, পিসাতে—তার বাবা অবিশ্রান্ত বেড়াতেন—তার দশ বছর বয়সে তারা শেষ যেবার ইটালিতে যায়, তার স্পষ্ট মনে আছে। ইজিয়ান সমুদ্রের নীল জল এখনো তার চোখের সাম্‌নে কাঁপে। 'আ', অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে সে বলেছিলো, 'যদি ওখানে ফিরে যেতে পারতুম। ইটালি আমার দেশ।'

'আর আমার। কিন্তু আপনারা চলে এলেন কেন?'

'বাবা চলে' এলেন। ব্যবসাতে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিলেন। যত দ্রুতবেগে যত বেশি পয়সা তিনি করতে আশা করেছিলেন, তা তাঁর হচ্ছিলো না। তাঁর অসম্ভব উৎসাহ ছিলো—আর উচ্চাশা ছিলো। ইয়োরোপে গিয়েছিলেন এক মাড়োয়ারির এজেন্ট্ হয়ে। চামড়া। তা ছাড়া আরো নানারকম ছিলো। তাঁকে থাকতে হতো লণ্ডনে, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই এদিক-ওদিক যেতেন। অশান্ত ছিলো তাঁর আত্মা।'

'আর আপনার—আপনার আত্মাও কি অশান্ত?'

'ছিলো।'

'ছিলো?'

এমিলিয়া এমন ভাব দেখিয়েছিলো যেন সে কথাটা শোনে নি।—'বাবা প্রথমে একাই গিয়েছিলেন, কিন্তু ছ' মাস পর একবার দেশে এসেছিলেন মাকে নিয়ে যেতে। মা প্রথমটায় যেতে চান নি। তাঁর বাবা ছিলেন এক দিশি রাজ্যের মন্ত্রী—ছেলেবেলা থেকে তাঁর জীবন একটানা এক সুরে কেটেছিলো। কোনো খোঁচ ছিলো না কোথাও। মা পরিবর্ত্তন ভালোবাসতেন না। তাঁর কোনো কল্পনাশক্তি ছিলো না।'

'তা হ'লে তিনি সুখী—জীবন ভরে' সুখী···'

এমিলিয়া ক্ষীণ হেসেছিলো।—'কিন্তু সে—সময়টার নয়। ইয়োরোপ তাঁর ভালো লাগতো না। তিনি ছিলেন বিশ্রামে ভরা, ঘুমে ভরা। তাঁর চোখ উষ্ণ, ঘুমে ভরা। এখনো তার খানিকটা অবশিষ্ট আছে। আপনার তাঁকে দেখা উচিত।'

'আপনার চোখ কিন্তু অন্য রকম।'

'কী রকম?'

'তারা ধারালো—তলোয়ারের মত।'

'আ!' মুহূর্ত্তের জন্য এমিলিয়ার চোখ বুজে এসেছিলো।—'না—সে-সময়টা আমার মা-র ভালো কাটে নি—ইয়োরোপের শহর থেকে শহরে, সমুদ্রতীর থেকে সমুদ্রতীরে ভেসে বেড়ানো। আমার বাবাও ইটালিকে ভালোবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন যে আমার ইটালিতে জন্ম হোক্। সেইজন্য কয়েক মাস আগে থেকেই পিসাতে একটা বাড়ি নিয়ে ছিলেন। মরবার আগের বছর শেলি যে-বাড়িতে ছিলেন, সেটা ছিলো কাছাকাছি! বাবার সাহিত্যিক রুচি ছিলো, তিনি এপিসাইকিডিয়ন পড়েছিলেন। সেইজন্যই আমার নাম রেখেছিলেন এমিলিয়া।'

'আর শেষ পর্য্যন্ত কি ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

'তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন, অর্থোপার্জ্জনে নয়, উপার্জ্জন

যথেষ্ট হচ্ছে না বলে'। ফিরে এলেন দেশে। চেষ্টা করলেন ষ্টক এক্সচেঞ্জে পয়সা করতে। প্রথম কিছুদিন ভাগ্য অজস্র বর্ষণ করলে। তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু তার পরেই ধরলো মন্দা। লোকসান হতে আরম্ভ করলো। বাবা রাগে কালো হ'য়ে গেলেন, তাঁর জেদ চড়ে' গেলো।'

'লোকসান হ'তেই থাকলো?'

'সবই হয়-তো যেতো, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বাবা তার আগেই মারা গেলেন। আমার আশা ছিলো, কোনোদিন আবার ইয়োরোপে ফিরে যাবো—ইটালিতে—সে-আশা গেলো। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুসি হলাম; আপনি আমার মনে ইটালিকে ফিরিয়ে আনলেন—আনবেন।'

নাচের এক পাক শেষ হলো, মিসেস্ চম্‌লি ফিরে এলেন। মিস্‌টর রয়্ কি একটু নাচবেন না? না, বসে'-বসে' দেখতেই বেশি ভালো লাগে। কিন্তু মিস্‌টর রয় এত সুন্দর নাচেন। তিনি কি বলতে পারেন প্যারিসে নতুনতম কী-কী নাচ চলছে? আলাপ সাধারণতার স্তরে নেমে এলো। এমিলিয়া খুব কমই কথা বললে।

আর তারপর—পনেরো দিনের মধ্যে তারা ভালোবাসতে আরম্ভ করলে। সেটা যেন অনিবার্য্য, সেটাই তাদের নিয়তি। দু'জনেই যেন অনেক দিনের হারানো কোনো জিনিস খুঁজে পেয়েছে, এম্‌নি হিংস্র আবেগে একজন আর একজনকে দখল করলে। তাদের জীবনে আর-কিছুই যেন রইলো না—এই প্রেম ছাড়া। তবু তাদের সাবধানতার সীমা ছিলো না। না, সুনাম নয়। জীবনের সেই ভয়ঙ্করতম জুজুর ভয় এমিলিয়া কাটিয়ে উঠেছিলো অনেক আগেই। অন্য-কিছু। যেন আরতির ধোঁয়া উঠছে মন্দিরে। মন্দির গোপন রাখতে হবে। প্রবৃত্তিগত এই উপলব্ধি। এ নিয়ে আলাপ করবার দরকার হ'লো না। উভয়েরই রক্ত যেন একই সময়ে কথা কয়ে' উঠলো: গোপন রাখতে হবে।

সপ্তাহে তিন দিন, চারদিন—কখনো-কখনো তা'রও বেশি—তারা মিলিত হতো—দীর্ঘ সময়, দীর্ঘ উন্মাদনা যাপন করতো—কোনো সময়হীনতায়, কোনো চিরন্তনতায়। ভাস্কর একটা ফ্ল্যাট নিয়েছিলো ক্যামাক ষ্ট্রীটে। গাছে আর নির্জ্জনতায় ঘেরা বাড়ি। তার ঘরকরনার ভার নিয়ে ছিলো এক আধা-ইংরেজ স্ত্রীলোক। দোতলার ছোট বসবার ঘরটি ভরে' বিলাসিতার সূক্ষ্ম সৌরভ। আয়নাগুলো দীর্ঘ, স্ফটিক-স্বচ্ছ। প্রশস্ত ডিভানে ডুবে গিয়ে সারাবেলা শুয়ে-শুয়ে কাটিয়ে দেয়া যায়। কাশ্মিরের গালিচা, বাঘের চামড়া—পায়ের তলায় এমন উষ্ণ আর নরম। আধো-আলোয় ঝল্‌মল্ করতো এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোট-ছোট ব্রোঞ্জ্ মূর্ত্তি। এমিলিয়া ঘরটিকে ভালোবাসতো। শোবার ঘর পাশে—দক্ষিণে তার জানলা। ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়—জিনিসপত্রও কম। বসবার ঘর থেকে এসে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতো। প্রকাণ্ড খাট—এমন কালো, এমন শক্ত দেখতে—মনে হয়, পাথর কুঁদে যেন তা তৈরি। চারটি পায়ার নিচে চারটি বিকট গার্গয়ল মুখ। তাদের চোখ—ট্যারা, ডিমের মত কপাল। 'শয়তানকে তাড়াবার জন্য', ভাস্কর হেসে বলতো, 'ঘুমের মধ্যে যে-শয়তান হানা দেয় তাকে ভয় পাওয়াবার জন্য।' আর, বিছানায় শুয়ে, মধুর ক্লান্তিতে গলে' যেতে-যেতে, ভাস্করের চোখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমিলিয়া বলেছে: "গার্গয়লরা হাসছে। আর বোধ হয় শয়তান লুকিয়ে আছে কোনোখানে খাটের নিচে।' 'থাক্—মেঝে থেকে এতটা উঁচু—কোনো অসুবিধে হবে না তার।' তারপর তারা একসঙ্গে হেসেছে।

ভাস্করের ষ্টুডিয়ো তেতলায়—আধ-খানা ঘরে। কাঠ আর কাচ দিয়ে সে নিজে এটা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলো। খালি মেঝে। দুটো-একটা চেয়ার। একটা ইজি চেয়ার—মডেলদের বিশ্রাম করবার জন্য। আঁকবার সময় সে নিজে কখনো বিশ্রাম করতো না। রঙ্-লাগা হাত দুটো পিঠের তলায় একত্র করে' পায়চারি করে' বেড়াতো। যেন আগুন জলছে তার মধ্যে। তবু—একটা ছবিও সে প্রায় শেষ করতে পারতো না। ষ্টুডিয়োতে অর্দ্ধ-কৃত, প্রায়-সমাপ্ত, সদ্য-আরব্ধ কাজের ছড়াছড়ি। স্ত্রীলোক—দু'হাত দিয়ে তাদের চাঁদের মত চ্যাপ্টা, গোল বক্ষের সবটা ঢাকতে পারে নি; কোনো বুড়ো মানুষ—তার চোখের শাদা সিদ্ধ আলুর মত বেরিয়ে আসছে; রবিবারের সকালে ভিখিরির মিছিল—ক্ষুধিত লুব্ধ অশুভ সব মুখ, মোটা, রূঢ় কয়েকটা রেখায়। ছবিগুলো ঠিক 'স্বাভাবিক' হতো না—খাটের পায়ার

গার্গয়লদের ছাপ যেন পড়েছে। অসমাপ্ত বলে' গ্রোটেস্‌ক্ ভাবটা আরো পরিস্ফুট হতো। মূর্ত্তিগুলো যেন কোনো অদৃশ্য নরক থেকে উঠে এসেছে এইমাত্র। 'শয়তানই তোমার রাজা', এমিলিয়া হেসে বলেছে। কিন্তু ইটালির কতগুলো স্কেচ ছিলো—ফ্লরেন্স্, ভিনিস,আর্নোর রূপালি জলে কালো ছায়া, মেদিচিদের প্রাসাদ জ্যোৎস্নায় আর স্মৃতিতে নিঃঝুম—সেগুলো এমিলিয়া ভালোবাসতো। 'এগুলোই তোমার সবচেয়ে ভালো।'

'তখন আমার প্রতিভা ছিলো.' ভাস্কর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছে।

'ছিলো?' তাদের প্রথম আলাপের কথা স্মরণ করে' এমিলিয়া প্রতিধ্বনি করেছে।

'দুঃখ করি নে। সৌন্দর্য্যকে তো পেয়েছি। প্রতিভা কি সৌন্দর্য্য—দু'য়ের একটা থাকলেই বাঁচা যায়। দুটোই যদি হারাতে হয়—তখনই মৃত্যু।'

'আমি কি এতই সুন্দর? বলো—সত্যি বলো।'

'আ—কী করে' এত সুন্দর হ'লে?'

'তোমারই জন্য—কারো মিয়ো, তোমারই জন্য।'

সেই ফ্ল্যাটে এমিলিয়া আসতো—তার সমস্ত শরীর বিদ্যুৎময়, তার হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত স্পন্দমান। বাইরে তারা যেতো না। মিসেস্ কার্সন তাদের কক্‌টেইল দিয়ে যেতো। মৃদুস্বরে, অলসভাবে, অন্তহীনভাবে তারা কথা বলে' যেতো। দিনের আলো ম্লান হ'য়ে আসতো তাদের চোখে—মিসেস কার্সন কতগুলো আশ্চর্য্য রেসিপে জানতেন। জীবন হ'য়ে উঠতো চিরন্তন গোধূলি।

কেউ জানলে না। বাড়িতে—এমিলিয়া কোনোদিন বেরুচ্ছে শাড়ি কিনতে, কোনোদিন যাচ্ছে ডেন্টিস্‌টের কাছে, কোনোদিন বা ডগ্-শো। আজ নবাবজাদি রিনি মম্‌তাজের লঞ্চে গঙ্গায় বেড়ানো; কাল পেলিটিতে পার্টি—এক মার্কিন ভারত-বান্ধবীকে উপলক্ষ্য করে'; তার পরদিন অ্যাসেব্লিতে উত্থাপিত কোনো স্ত্রী-সংরক্ষণ বিল্ আলোচনা করবার জন্য নিউ এম্পায়ারে মহিলা-সম্মেলন—লাটপত্নী উপস্থিত থাক্‌বেন। মিসেস্ চ্যাটার্জি শুনে যেতেন: কিছু বলতেন না। এমিলিয়ার ও-সব বলবার কিছু দরকার ছিলো না: মিসেস চ্যাটার্জির আর কোনো কৌতূহল ছিলো না তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিলেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে, তিনি ঘুমে ভরে' আসছিলেন।

প্রকাশ্যে, অন্য লোকের উপস্থিতিতে, তাদের দু'জনের যখন দেখা হ'তো, তারা নিখুঁত নাগরিকতার স্বচ্ছন্দ সৌজন্যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করতো। আলাপ করতো আর্ট নিয়ে। আলাপ করতো ফ্লরেন্স্ নিয়ে। ব্রাউনিঙ্ নিয়ে। তাদের আলাপ এমনই উন্মুক্ত, অনাড়ষ্ট যে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারতো না।

তাদের এই ভালোবাসায় একটা অদ্ভুত দ্বীপান্তর-সৌরভ ছিলো। তারা দু'জনেই দীর্ঘকাল বেঁচেছে। অনেক দেখেছে—জেনেছে। এমিলিয়ার চোখে সেই জানার ঝিলিমিলি। ভাস্করের নিবিড়তম চুম্বনও সেই আলো-কে একেবারে নিবিয়ে দিতে পারতো না। আর তবু—এমিলিয়া চাইতো সে-আলো নিবে যাক্; চাইতো, সে অন্ধ হ'য়ে যাক্। আ—এত দেখবার পর অন্ধ হ'য়ে যাওয়া, তা'র মত আর কী?

আর ভাস্কর—তার পাৎলা ব্রাউন মুখে ছোট-ছোট সূক্ষ্ম রেখা—সময়ের স্বাক্ষর—এত নরম, এত সূক্ষ্ম, সময় যেন ভালোবেসে হাত বুলিয়ে গেছে। অনেক দেশের অনেক সূর্য্যে ঝুনো তার মুখ। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ। তাঁর পয়সা ছিলো। জীবনের কোনো নোঙর ছিল না। ভেসে-ভেসে বেড়িয়েছে পৃথিবীময়। দেখেছে জীবন—জীবন, যা সবখানেই ছড়িয়ে আছে, শেষ পর্য্যন্ত যা সবখানেই এক। গন্দোলায় শুয়ে-শুয়ে ভিনিসের আশ্চর্য্য সন্ধ্যার মধ্যে মিশে গেছে, টিরোলের বসন্তকে শোষণ করে' নিয়েছে রক্তে। গভীর রাত্রে সীনের অদৃশ্য কালো জলের দিকে তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে, মরতে চেয়েছে। দীর্ঘ বিকেল ভরে' স্প্যানিশ রোদ পুইয়েছে, টিকটিকির মৃত অলস। সে রুমানিয়ায় গিয়েছিলো—রাস্তার এক স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েছিলো। গোল, কালো তার চোখ। সে দুটো ফরাসি কথা বলতে পারতো, ইংরিজি একটাও নয়। তাদের কথা বলবার উপায় ছিলো না। ভাস্কর তার নামটা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেনি। ব্যাপারটা একটু মজারই হয়েছিলো।

আর তারপর—সবার পর—দেশে ফিরে আসা। ঘুরে

বেড়িয়ে আর লাভ কী, জীবন সবখানেই একরকম। কিন্তু কে জানতো—দেশে, কলকাতাতেই তার জন্য অপেক্ষা করছে, পৃথিবী ভরে' যা সে খুঁজেছে, যা পাওয়া যায় না বলে' নিজকে সে প্রায় বিশ্বাস করিয়েছিলো।

এমিলিয়ারা থাকতো পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্ব্বপ্রান্তে—মরবার আগের বছর হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় মিস্টর চ্যাটার্জি সেটা কিনেছিলেন। বাড়িটা বেশ বড়। বড়-বড় ঘর—ক্লান্ত, ঘুমন্ত যেন। ঠিক তার মা-র মত—এমিলিয়ার জীবন যা' হতে যাচ্ছিলো, তার মত। বাড়িটা তার ভালো লাগতো না। ভাস্করের বসবার ঘরে সেই উষ্ণ গোধূলি—কী মুক্তি! তাদের মধ্যে দশ মিনিটের রাস্তা। এমিলিয়া হেঁটেই আসতো। দ্রুত, অসমান পদক্ষেপে সে হাঁটতো—যেন পালাচ্ছে। মাঝে-মাঝে চোরাদৃষ্টিতে তাকাতো ডাইয়ে-বাঁয়ে, হঠাৎ থেমে যেতো কখনো বা—যেন কোনো চিন্তার আঘাতে। ঠোঁট একটু নড়তো। তারপর আবার চলতে আরম্ভ করতো আগের চাইতে দৃঢ় পদক্ষেপে।

একদিন—একরাত্রে পুরোদলটি ফিরপোয় সমবেত, ডিনারে, রঞ্জনপুরের রাণীর নিমন্ত্রণে। খুব জমকালো ব্যাপার। হীরে-মুক্তোর ঝলমলানি। রেশমের খসখসানি। আলো-দিয়ে-বোনা সান্ধ্য গাউন হাঁর মেনেছে সাপের মত পেঁচিয়ে-ওঠা, স্বপ্নের মত জড়িয়ে-ধরা শাড়ির কাছে। কথার আর হাসির স্রোত, আর শ্যাম্পেনের। কিন্তু দশটা বাজতেই এমিলিয়া উঠে দাঁড়ালো। তাকে এখন যেতে হবে। তার শরীর কেমন করছে, তার মাথা ধরেছে।

প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠলো। রঙ্গিণী সেন ইংরিজিতে বললে 'মাই ডিয়ার, তোমার হয়েছে কী?'

বিনায়ক, রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র, তার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে মারলো: 'Stay a moment longer, can't you?'

'I'm sorry', এমিলিয়া মৃদুস্বরে বললে, 'I'm sorry' সে হাসলো, মধুরভাবে—যেমন উচিত। এগিয়ে গেলো রাণীর কাছে. বিদায় নিতে। সে যখন ফিরে আসছে, সেই প্রকাণ্ড ষোড়শ লুই সেলুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাস্কর তার চোখের দিকে তাকালো। মাথা একটু নত করে' ইংরিজিতে বললে:

'আমি কি আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে পারি?'

এমিলিয়ার চোখ সম্মতিতে হাসলো।

বাইরে, তারা একটা ট্যাক্সি নিলে। বাতাস শিরশির করে' উঠছে রাত্রিতে। ট্যাক্সির সেই ধাবমান অন্ধকারে, এমিলিয়া এক হাত দিয়ে ভাস্করের মুখ তার মুখের কাছে টেনে আনলে। তার চোখের ভিতরে একটু তাকিয়ে থেকে বললে:

'তোমাকে ভালোবাসি—তোমাকে ভালোবাসি।'

'এমিলি!'

'তুমি বলো—বলো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি জানো তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

'তবু—বলো। আবার বলো।'

'লক্ষবার, লক্ষবার, এমিলি—তবু সব বাকি থেকে যাবে।'

'আ—এ-কথা বলবার জন্য, মনামি, এই নাও।'

আর, চুম্বনের পরে:

'সুখী? তুমি এখন সুখী?' ভাস্কর প্রশ্ন করলে।

সুখে মুহ্যমান, রুদ্ধশ্বাস, এলিমিয়া উত্তর দিলে:

'আমি সুখী, সুখী! সুখে আমি পাগল হ'য়ে যাবো, ভাস্কর।' তারপর, তার কাঁধের উপর মুখ চেপে ধরে':

'এতদিন তুমি কোথায় ছিলে! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে!'

তার গলা যেন ভেঙে পড়ছিলো। সূক্ষ্ম, চেতনাময় অঙ্গুলি-বৃন্ত দিয়ে তার চুলের ভাগ-রেখা অনুভব করতে-করতে ভাস্কর বললে: "চুপ করো, চুপ করো।'

একটি সুখময় মুহূর্ত্ত, এমিলিয়া রইলো স্তব্ধ হ'য়ে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর মুখ তুলে, সামনের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত চাপা গলায় বলতে লাগলো:

'এর আগে কেন তুমি আসতে পারো নি? তুমি যদি জানতে! তুমি যদি জানতে কী একা আমি ছিলাম যতদিন তুমি আসো নি!'

'জানি, জানি! আমিও ছিলাম একা।'

'আমি মরে' যাচ্ছিলাম। মাঝে-মাঝে আমার মনে হতো ...আমি মরে যাচ্ছি। ভাবতুম, মৃত্যু কেমন। মৃত্যু ভয়ঙ্কর। মৃত্যু নিঃসঙ্গ। কিন্তু—জীবনও তো নিঃসঙ্গ।'

ভাস্কর একবার কেঁপে উঠলো—মৃত্যুর চিন্তা তার হৃৎপিণ্ডে হিমস্পর্শের মত।—'ও-সব কথা এখন কেন বলছো?'

'তুমি এলে। তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে ছিনিয়ে আনলে। তুমি আমাকে প্রাণ দিলে। আমি কখনো ভাবি নি—কখনো ভাবি নি, জীবনে এত থাকতে পারে। কারো মিয়ো, কারো মিয়ো, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো—সত্যি? বলো, বলো।' তারপর, ভাস্করের ঠোঁট যেই কথা বলবার জন্য খুলছে, তার শরীরের উপর নিজকে লুটিয়ে দিয়ে এমিলিয়া বলে' উঠলো:

'জানি, জানি; কিন্তু আরো, ভাস্কর—আরো। আরো ভালোবাসতে আমাকে পারো না? আরো, আরো, আরো। ভালোবাসার জন্যে আমি মরে' যাচ্ছি। তোমার ভালোবাসাতেই আমি বেঁচে আছি। কারো মিয়ো, যে-মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে আর ভালোবাসবে না, সে-মুহূর্ত্তে আমি মরে' যাবো।'

উত্তরে, ভাস্কর দু'বাহুর মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে' সস্নেহে তার মুখের উপর চুম্বন করলে। এমিলিয়া চুম্বন ফিরিয়ে দিলে। তারপর আবার—দীর্ঘ, উষ্ণ, সুরভিময় একটি চুম্বন।

তারপর এমিলিয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। অলসভাবে, তরলভাবে ভাস্করের চুলগুলো দু'হাতে এলোমেলো করে' দিতে-দিতে সে বললে, 'আ—এখন আমি জানলুম। কী করে'—কী করে' তুমি আমাকে এত ভালোবাসতে পারলে?'

'এর বেশি কেন ভালোবাসতে পারি নে?' ব্যথিত, আহতস্বরে ভাস্কর বলতে লাগলো, 'এর বেশি কেন ভালোবাসতে পারি নে? যদি লক্ষবার মরে' যাই, তবুও তো এর বেশি ভালোবাসতে পারবো না।'

'কারো মিয়ো, তুমি আমাকে ভালোবাসবে—চিরকাল? তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে না? কারো মিয়ো, যদি কখনো তুমি আমাকে ভালো না বাসো—কী উপায় হবে আমার? ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমার কী উপায় হবে?' অর্দ্ধ-স্ফুট গুঞ্জনে এমিলিয়ার বিহ্বল কথাগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেলো।

পরে, ভাস্করের বসবার ঘরের আলো-ঠিকরে-পড়া লম্বা আয়নায় এমিলিয়া যখন তার প্রসাধনের শেষ খুঁটিনাটি ঠিক করে' নিচ্ছে, একটু দূরে ডিভানে বসে' সিগ্রেট খেতে-খেতে তার প্রতিমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ভাস্কর বললে:

'এখনই যাবে?'

'যেতে হবে, মনামি।'

'আর দশ মিনিট থাকতে পারো না—পাঁচ মিনিট—দু' মিনিট?'

'মনামি, বারোটা বেজেছে।'

'মোটে বারোটা।'

"কিন্তু যেতে তো হবে, মনামি।"

সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাস্কর উঠে দাঁড়ালো। এমিলিয়া আয়নায় দেখলে, সে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর, একটু পরে—সে তার দু'হাত অনুভব করলে তাকে ঘিরে। সে ফিরে তাকিয়ে হাসলো, চোখ বুজলো। তারা চুম্বন করলে।

তারপর ভাস্করকে সে দূরে সরিয়ে দিলে। দু' হাত সোজা বাড়িয়ে তাকে দূরে ঠেলে রেখে', চোখ দিয়ে হাসতে-হাসতে বললে:

'তা হ'লে—গুড্ নাইট।'

'না—*good* night নয়।' কথাটা ভাস্করের অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো; শেলি থেকে যে চুরি করছে, তা তখন সে জানতেই পারলো না।

'আচ্ছা—ও রেভোয়া, তা হ'লে। ও রেভোয়া।' হঠাৎ ভাস্করের হাত ছেড়ে দিয়ে সে ছুটে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে চেপে ধরলো বুকের উপর।—'কী বোকা! আমি কী বোকা!' আর্ত্তস্বরে সে বলে' উঠলো "আমি এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে চাই। আ—কেন আমাকে তোমায় ছেড়ে যেতেই হবে।'

সূক্ষ্ম, অন্তরঙ্গ আদরে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে-করতে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলে:

'কাল কখন আসবে?'

'কাল তো আসতে পারবো না', এমিলিয়া হঠাৎ বলে' ফেললো।

সঙ্গে-সঙ্গে ভাস্কর শক্ত হ'য়ে গেলো। এমিলিয়ার কাঁধের উপর তার অঙ্গুলিপ্রান্তগুলি গেলো স্তব্ধ হ'য়ে। তীব্র, দ্রুত দৃষ্টিতে এমিলিয়া তার দিকে তাকালো—কিছু সন্দেহ করে'। 'কী হলো?' ভীতস্বরে সে বলে' উঠলো, 'কী হলো?'

তাকে ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর একটু দূরে সরে' গেলো।—'কাল কেন আসতে পারবে না?'

ও, এই! এমিলিয়ার বুক থেকে একটা ভার নেমে গেলো। একটু হেসে বললে, 'কাল না হয় আসতে পারবোই না। কী হয়েছে তাতে?'

'কেন তুমি কাল আসবে না?' ভাস্কর অন্ধভাবে বললে 'আমি তোমাকে চাই।'

তার কণ্ঠস্বরে কী একটা ছিলো, যা মোহের মত, বিষের মত এমিলিয়ার রক্তে সঞ্চারিত হলো। 'কেন তুমি আমাকে এমন করে' চাও?' মুগ্ধের মত সে বললে, 'কেন তুমি আমাকে এত বেশি করে' চাও? আমি কী?—আমার কী আছে?—আমি কী তোমাকে দিতে পারি?'

'আমি তোমাকে চাই। যা-কিছু তুমি—সব। তোমার সব। সব, সব। সব তোমাকে দিতে হবে।'

'কিন্তু আমি কি—'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি', এমিলিয়ার কথার উপর ভাস্করের মন্থর, গম্ভীর স্বর ভেঙে পড়লো—যেন কোনো পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করছে—'আমি তোমাকে চাই। তুমি যখন আমার কাছে থাকো না, প্রতি মুহূর্ত্ত আমার কাছে যন্ত্রণা। প্রতি মুহূর্ত্ত তোমার কথা ভাবি—তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি নে। যন্ত্রণার মত—তুমি। তুমি যখন আমাকে ছেড়ে থাকো, প্রতি মুহূর্ত্ত আমার কাছে যন্ত্রণা। তোমার একটি মুহূর্ত্তও আমি ছাড়তে প্রস্তুত নই। কত সময় তুমি কাটাও—তুচ্ছ কথায়, এর সঙ্গে আর ওর সঙ্গে। ওদের সঙ্গে তুমি কেন থাকবে? ওরা তোমার কে? ওরা তোমার কী বোঝে? ওরা তো তোমাকে ভালোবাসে না। তবে—তবু—কেন নিজের এই অপচয়? কেন নিজকে নষ্ট করা? এত সময়—এত সময়! ভাবলে পাগল হয়ে যেতে হয়, এমিলি।'

এমিলিয়া মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো, কিছু বলতে পারলে না। ভাস্কর বলে' চললো:

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর কেউ কখনো তোমাকে এমন ভালোবাসবে না। আমি তোমাকে চাই। আর কেউ এমন করে' তোমায় কখনো চাইবে না। তোমার চাওয়ার ধারে আমার আত্মা ক্ষয়ে' যাচ্ছে। কেন তুমি আমায় যন্ত্রণা দাও? এমিলি; আমার জানতে দাও, আমায় বলতে দাও—তুমি আমার! তুমি আমার!"

আর হঠাৎ, সেই তার সর্পিল শাড়ি আর হীরের ঝিলিমিলি আর আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চুলের রাশি নিয়ে এমিলিয়া নতজানু হয়ে ভেঙে পড়লো, ভাস্করের পায়ের কাছে। দুই দীর্ঘ, শুভ্র বাহু সে তুলে দিলে ভাস্করের জানুর উদ্দেশ্যে। স্তম্ভিত, ভাস্কর তাকিয়ে রইলো। এমিলিয়ার বাহু শ্লথ হয়ে পড়ে' গেলো; তার আংটির হীরের আলো লেগে ঝলসে উঠলো ক্ষণিক দ্যুতি-তীর। সে মুখ তুলে তার প্রেমিকের দিকে তাকালে, আর বললে:

"ক্ষমা করো—আমায় ক্ষমা করো। কী করে' কথা বলতে হয়, আমি জানিনে। কী করে' আমি তোমাকে বোঝাতে পারি যে আমি তোমার—তোমার—তোমার।' বলতে-বলতে হাতের মুঠো শক্ত করে' সে শূন্যে বাড়ি মারতে লাগলো। 'আমি তোমার—তা ছাড়া আর কারো নই। আমার সব—তোমার। সব—সব। তুমি আমাকে নাও। তুমি আমাকে নিয়ে যা খুসি করো। তুমি আমাকে যা বলবে আমি তা-ই করবো। আমি আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে ছিঁড়ে আনবো—তুমি যদি তা-ই চাও। শুধু—তুমি আমায় কষ্ট দিও না। তুমি আমার দিকে অমন করে' তাকিয়ো না। আমাকে দোষী করে' তুলো না তোমার কাছে। আমায় ভালোবেসো।'

বলতে-বলতে তার চোখ জলে ভরে উঠলো। আর ভাস্কর এলো এগিয়ে, দু'হাতে ধরে' তাকে তুললো, তুলে নিয়ে বসালো ডিভানে, তার পাশে; তাকে আহত, আচ্ছন্ন, মূর্চ্ছিত করে' দিলে ক্ষুধিত, নিষ্ঠুর চুম্বনে-চুম্বনে। আশ্ব, যখন ঝড় কেটে গিয়ে শান্ত-সোনালি সুখ নিটোল আঙুরের মত ফলে' উঠেছে

তাদের মাঝখানে, এমিলিয়া যখন দ্বিতীয়বার স্রস্ত চুল ঠিক করবার জন্য আয়নার কাছে উঠে যাচ্ছে,

'কাল এসো', ভাস্কর বললে, 'বিকেলে। ছটো।'

'আড়াইটে, মনামি।'

'না, ছটো।'

'মনামি—'

'বেশ—ছটো পনেরো। আর দেরি নয়।'

এমিলিয়া মৃদুস্বরে হেসে উঠলো।—'তুমি আমাকে এতই ভালোবাসো? সত্যি?'

কাটলো দু'মাস। এসে পড়লো শীত। শীত আরম্ভ হলো ঠাণ্ডা কয়েক পশলা বৃষ্টি নিয়ে। আর তারপর—আশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য, অপরূপ। ভারতবর্ষের এই শীত—সমস্ত বিশ্ব যেন নীল আকাশ আর সোনালি রোদে ভরে' গেছে। ঈশ্বরের একটা মিরাক্‌ল্ মনে হয়। পূজোর সমন্বকার তন্দ্রা থেকে কলকাতা জেগে উঠছে। বড়লাট এসেছেন। আমেরিকান ট্যুরিস্টরা আসছে। প্যারিস থেকে এসেছে এক নাচের দল, চার্লি চ্যাপলিনের নতুন ছবি নিউ এম্পায়ারে কাল খুলবে, সিব্‌ল্ থর্‌ন্‌ডাইকের আসবার তারিখ ঘোষিত হ'য়ে গেছে। এবারকার সীজ্‌ন্‌টা খুব ব্রাইট্—সবাই বলছে।

পূজোটা তারা কাটিয়েছিলো মুসৌরিতে। এমিলিয়া গিয়েছিলো আগে, দলের লোকের সঙ্গে। দুদিন পর, ভাস্কর। তাদেরকে বিস্মিত হবার ভাণ করতে হয়েছিলো।

তারা ছিলো একই হোটেলে: এমিলিয়াই পাশাপাশি দুটো ঘর নিয়েছিলো—দলের কেউ তা জানতো না। ভাস্কর এসেই যে ঠিক এমিলিয়ার পাশের ঘরটা পেয়ে গেলো, এ-দৈবঘটনাকে তারা সন্দেহের চোখে ছাখে নি। তারা কিছুই সন্দেহ করে নি: সন্দেহ করবার কথা তাদের মনে হয়নি। এমিলিয়াকে তারা ধরে' নিয়েছিলো সন্দেহের অতীত বলে'। সীজরের স্ত্রীর অর্থে নয়, অবিশ্যি। তার সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সম্বন্ধেই তারা সন্দিহান হ'য়ে উঠছিলো। আর—মনে সন্দেহ ঢুকলেই প্রমাণের অভাব হয় না; কিন্তু সন্দেহ না থাকলে সবই সহজ মনে হয়। কারো চোখে কিছু ঠেকেনি।

কিন্তু, মুসৌরি তারা উপভোগ করেনি। এত বেশি লোক চারদিকে। আর হোটেলের নির্ব্বোধ আমোদের রুটিন। ইচ্ছে না থাকলেও যোগ দিতে হ'তো। দু'দিনেই তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো। এমিলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করেছিলো—ক্যামাক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটের সেই বসবার ঘরের কথা ভেবে। কলকাতা থেকে না বেরোলেই ভালো হতো—একবার তাদের মনে হয়েছিলো। কেউ সেখানে নেই—চমৎকার হতো। মানুষ এমন ভুলও করে।

যাক্—আবার কলকাতা। কলকাতা—এবং শীতকাল। রোজ ঘুম থেকে উঠে সকালের রোদের দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া মনে-মনে বলতো:

'আজকের দিনটি এমন সুন্দর—সে আমাকে ভালোবাসবে বলে'।'

একরাতে তারা এম্পায়ারে গেলো প্যারিসের নাচ-ওয়ালিদের দেখতে। হৃৎভঙ্গকারী নাচ। ভাস্কর কোনো-রকমে বসে' রইলো। নেহাৎই ভদ্রতা করে, নেহাৎই বেরোতে হ'লে অনেকগুলো পা মাড়াবার আশঙ্কা আছে বলে' তারা থাকলো শেষ পর্য্যন্ত।

বেরিয়ে এসে তারা ভিড়ের ভিতর দিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে গিয়ে দাঁড়ালো একটা ট্যাক্সির জন্য। সেই সময়ে গ্র্যাণ্ডের ব্যিফে থেকে নিখুঁত ড্রেস-স্যুট পরা এক বাঙালি ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন। ভদ্রলোক তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করলেন, থমকে দাঁড়ালেন, একটু ইতস্তত করলেন। এমিলিয়া লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিলো—দেখতে পেলো ভদ্রলোককে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ একটু ম্লান হ'য়ে গেলো।

ভদ্রলোক হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।—'কী সৌভাগ্য, এমিলি!'

ভাস্কর অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলো, তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে মুখ ফেরালো। এমিলিয়া তাড়াতাড়ি বললে, 'প্রদোষ ঘোষ—ভাস্কর রায়।'

অভিবাদনাদির বিনিময় হ'লো। ভাস্কর এক দৃষ্টিতে প্রদোষ ঘোষকে আগাগোড়া দেখে নিলে, মনে-মনে আঁচ করে' নিলে। অত্যন্ত স্পষ্টত সুপুরুষ। মুখে স্বাস্থ্যের রক্তাভা। সরল, প্রফুল্ল মুখের ভাব—জন্ম-অপ্‌টিমিস্ট্। সেই ধরণের

লোক, জীবন যাদেরকে কখনো হতাশ করে না। যে-ভাবেই হোক্, বেঁচে থেকে তারা সুখ পায়—এবং অন্যকে তা টের পেতে দেয়।

'এমিলি!' প্রদোষ আন্তরিক আনন্দে হাতের সঙ্গে হাত ঘষলো। 'কেমন আছো? কেমন ছিলে? কতদিন পর দেখা, বলো তো?'

এমিলিয়া ঠাণ্ডা স্বরে বললে, 'কবে এলে কলকাতায়?'

'এই তো দিন দুই—ক্রিসমাস করতে এলুম।' নিজকে বিদ্রূপ করবার ধরণে প্রদোষ হেসে উঠলো।

'কোথায় না আছো আজকাল—লক্ষ্ণৌ?' এমিলিয়া জানতো, ইচ্ছে করে' ভুল বললে।

'ম্যাড্রাস—ম্যাড্রাসে ঠেলেছে। লক্ষ্ণৌ ছিলুম গেলো বছর। ম্যাড্রাসে নাকি চিরবসন্ত। চমৎকার জায়গা, সবাই বলে। আমার কিন্তু মন বসে না। আমার মন পড়ে' থাকে কলকাতায়।'

স্বচ্ছ, সরল চোখে প্রদোষ এমিলিয়ার দিকে একটুখানি তাকিয়ে রইলো।—'এখানে এসে তোমার কথা মনে হয়েছে। শিগগিরই যেতুম তোমাদের বাড়িতে—তার আগেই দেখা হ'য়ে গেলো। কে ভাবতে পেরেছিলো!'

সুখে, আত্ম-প্রীতিতে প্রদোষ একটু স্ফীত হ'লো; এইমাত্র সে দুটো হুইস্কি খেয়েছে।

এমিলিয়া ভদ্রভাবে বললে, 'যেয়ো একদিন আমাদের ওখানে।'

'নিশ্চয়ই। তোমার মা-র সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। কেমন আছেন তিনি?'

'As usual.'

'আর তুমি—তোমার কথা আর জিজ্ঞেস করবো কী, দেখতেই তো পাচ্ছি। You are looking prettier than ever. কী হয়েছে তোমার? এত সুন্দর কী করে' হ'লে বলতে পারো?'

'ম্যাড্রাসের জল-বায়ু, দেখছি, ফ্রিভলিটির মস্ত বড় সহায়ক।'

প্রদোষ সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে হেসে উঠলো।—'বেশ বলেছো, মানতেই হবে।'

এমিলিয়া ভাস্করের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ঐ যে একটা ট্যাক্সি।' তারপর হঠাৎ:

'তোমার স্ত্রী কেমন আছে?'

'সে আছে বেশ। কলকাতার জন্য তার মন কেমন করে না। তার মত এই যে টাকা থাকলে যে-কোনো জায়গাতেই সুখী হওয়া যায়। মেয়েদের আত্মা নেই, এমিলি।' তারপর দাঁত বা'র করে' হেসে প্রদোষ বললে, 'তোমাকে বাদ দিয়ে বলছি।'

'তোমার ভদ্রতার সীমা নেই।'

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। প্রদোষ স্মিতমুখে একজন থেকে আর-একজনের মুখে তাকালো। তারপর বললে, 'আচ্ছা, তোমাদের আর ধরে' রাখবো না। আবার দেখা হবে।'

দু'জনে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।—'হ্যাঁ, যাবো একদিন,' প্রদোষ উচ্চস্বরে বললে, 'তোমার মা-কে বোলো। গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট, মিঃ রয়।'

'গুড-নাইট', নির্ভীবস্বরে ভাস্কর সাড়া দিলে। প্রদোষ যতক্ষণ এমিলিয়ার সঙ্গে আলাপ করছিলো, সে একটি কথা বলেনি। দাঁড়িয়ে ছিলো তাদের দিকে আধাআধি পিঠ ফিরিয়ে—এমন একটা ভঙ্গীতে যাতে ঠিক অভদ্রতা না হয়, অথচ নিজের বিচ্ছিন্নতা বেশ বুঝিয়ে দেয়া যায়।

ট্যাক্সিতে বসে'ও প্রথম দু'এক মিনিট সে কোনো কথা বললে না। তারপর, তারা যখন চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছে, সে হঠাৎ এমিলিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

''লোকটা কে?''

এমিলিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, 'একজন পরিচিত।'

'তোমাকে সে অনেকদিন থেকে চেনে, মনে হ'লো?'

'হ্যাঁ, পুরোনো চেনা।'

'পুরোনো—কতদিনের?'

এমিলিয়া সহজভাবে উত্তর দেয়াই ভালো মনে করলে।—'ও আসতো আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে—বছর তিনেক আগে—মা ওকে পছন্দ করতেন। আমার ও বন্ধু-মত ছিলো। ছেলেটি বোকা-বোকা, কিন্তু ওর মনটা ভালো। নেহাৎ মন্দ লাগতো না আমার ওকে।'

ভাস্কর বললো, 'হুঁ।'

কথাগুলো বলে' এমিলিয়া নিষ্কৃতি পেলো। স্বীকার করে' বাঁচলো সে। সে গোপন করে নি—না, কিছুই গোপন করে নি। যেটুকু মিথ্যে বলেছে তা না বললেই নয়। তার—ভাস্করের ভালোর জন্য তা দরকার। আর তা-ই তো সত্যি—সে যা বলেছে। সে যা বলেছে, তার বেশি প্রদোষ আর কী? এই প্রদোষকে যে সে কোনোদিন—ওঃ, এ-কথা কি ভাবা যায়? কী করে', কী করে' সে পেরেছিলো? কিন্তু সে নয়—সে নয়। অন্য-কোনো মেয়ে, যে প্রদোষের সঙ্গে—অন্য কোনো মেয়ে। সে-মেয়ে এখন মৃত। ভাস্করের দেখা পাবার পর তার নতুন জন্ম হয়েছে। সে নতুন, সে অন্য একজন। যে অতীত তার নিজের নয়, তা নিয়ে তার কিসের ভাবনা? কেন সে মনে করতে যাবে? কী করে'ই বা মনে করতে পারবে? তা অন্য একজন মেয়ের জীবনের কথা, যা সে একবার শুনেছিলো, শুনেই ভুলে গিয়েছিলো।

তারপর, ভাস্করের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে, এমিলিয়া যখন তার জুতো আর কোট খুলে রেখেছে আর ভাস্কর সিল্কের পাজামার উপর জড়িয়ে এসেছে হলদে-আর-কালো ড্রেসিং গাউন; যখন বসবার ঘরে ডিভানের উপর তারা বসেছে পাশাপাশি, একটা সীলস্কিন্ রগ্-এ পা জড়িয়ে, আর মিসেস কার্স তাদের সামনে ছোট একটি টেবিলের উপর দুটো গেলাস আর আধ বোতল পুরোনো ব্র্যাণ্ডি রেখে গেছে; যখন বাইরের শীতের পরে নিবিড় হ'য়ে এসেছে ঘরের উষ্ণ আরাম; যখন রাত্রি আর নীরবতা ছাড়া কোনোখানে কিছু নেই; তখন এমিলিয়া বললো, ভাস্করের গালের উপর সস্নেহে গাল রেখে:

'মনামি, কী হয়েছে তোমার? কথা বলছো না কেন?'

ভাস্কর মুখ ফিরিয়ে তার চোখের দিকে তাকালো, এক দীর্ঘ মুহূর্ত। সরল, উজ্জ্বল চোখ। কোনো দ্বিধা নেই। তারপর, প্রিয়ার দু' হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলে:

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

এমিলিয়া উত্তর দিলো, সহজভাবে: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসি নে।'

তারপর, এক মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ পরে: 'তোমাকে ছাড়া কাউকে কখনো ভালোবাসি নি।'

ভাস্কর একটু চমকে উঠলো। একটু ম্লান হ'য়ে গেলো তার মুখ। এমিলিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, 'সত্যি?'

এমিলিয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়লো।—'কত সত্য, তুমি যদি জানতে।'

ভাস্কর গেলাশ দুটো ভর্তি করলে। এমিলিয়া গেলাশে একটু ঠোঁট ছুঁইয়েই সেটা নামিয়ে রাখলে। তার ভালো লাগছিলো না। মনে-মনে সে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছিলো। তার প্রেমিকের মুখে ছায়া পড়েছে। ভাস্কর এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিলে, তারপর বললে:

'ঐ লোকটা—সে তোমার বন্ধু ছিলো।'

অকপট, মধুরভাবে, এমিলিয়া হাসলো। তার সুন্দর, শাদা দাঁতের সারিতে ইলেক্‌ট্রিক আলো ঝিলিক খেলে গেলো। 'নিছক বন্ধু', সে বললে, 'না—তাও নয়। An acquaintance, a mere acquaintance.'

কিন্তু ভাস্করের মুখ গম্ভীর, অন্ধকার। কঠিন তার চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি এমিলিয়াকে অতিক্রম করে' চলে' গেছে সামনের দেয়ালে। শরীরের কোনো ভঙ্গী না করে' সে বললে:

'সে তোমাকে এমিলি বলে' ডাকে।'

'মানুষের নাম নিয়ে মানুষে ডাকে না? মনামি, তোমার আজ মন ভালো নেই।'

'সে তোমাকে এমিলি বলে' ডাকে,' ভাস্কর আবার বললে, 'আমার তা ভালো লাগে না।'

'অনেকেই তো ডাকে।'

'তার গলার স্বর—তা অন্য রকম। তার ডাকবার ধরণ—তা অন্য রকম।' ভাস্কর হাত বাড়িয়ে আরো একটু ব্র্যাণ্ডি খেলে।

এমিলিয়ার চোখ কষ্টে অস্পষ্ট হ'য়ে এলো। ভাস্করের আরো একটু কাছে ঘেঁষে সে বললে: 'এ-সব কথা কেন বলছো, এ-সব কথার মানে কী?'

ভাস্কর মুখ ফিরিয়ে নিলে। আস্তে-আস্তে বললে, 'আর তুমি তাকে তোমার বাড়ি যেতে বললে।'

আর এমিলিয়ার চোখে আতঙ্কের দৃষ্টি ফুটে উঠলো। সে কি ভাস্করকে হারাতে যাচ্ছে—আজ—এতদিন পরে—এই তুচ্ছ কারণে? আ—ভাস্করকে হারালে সে কী করে' বাঁচবে? এই প্রেম না থাকলে সে কী করে' বাঁচবে? দু'হাতে সে জড়িয়ে ধরলো ভাস্করের ঈষৎ-আনত শরীর, অতি সুন্দর করে' ছাঁটা চুলের নিচে তার ঘাড়ের উপর নিবিড়-ভাবে মুখ চেপে ধরলো। তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে:

'কারো মিয়ো, কারো মিয়ো।'

কিন্তু ভাস্কর স্তব্ধ, নিশ্চল। মেঝের উপর আবদ্ধ তার চোখ। তার শরীরের ভারে এমিলিয়া নিজের বুক চূর্ণ করে' ফেলতে লাগলো; তার ঘাড়ে কানে, চুলের উপর এলোমেলো অজস্র চুম্বন বর্ষণ করতে-করতে বললে:

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর কাউকে কখনো ভালোবাসি নি—কখনো, কখনো নয়। বোঝো না 'কেন? কেন তুমি আমাকে কষ্ট দাও? তুমি যদি আমাকে কষ্ট দাও, তা হ'লে আমি কী করে' বাঁচি?' আর সে দু'হাতে ভাস্করের মুখ জোর করে' তার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলো।

ভাস্কর আস্তে-আস্তে তার দিকে মুখ ফেরালো।—'তোমার সঙ্গে—ঐ লোকটার—কখনো—কিছু—'

'কেন আমাকে কষ্ট দাও?' প্রায় আর্ত্তস্বরে এমিলিয়া বলে' উঠলো। 'কেন তুমি বুঝতে পারো না? বাড়িতে আসতে বলা—তাতে কি কিছু প্রমাণ হয়? ভদ্রতা—ভদ্রতাতেও কি দোষ? তা ছাড়া, আমি না বললেও ও যেতোই। মা-র সঙ্গে দেখা করতোই—মা ওকে পছন্দ করতেন। মনামি—এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নিজকে কেন তুমি কষ্ট দিচ্ছো? কেন নষ্ট করছো সময়? কেন অপব্যয় করছো—আমাদের প্রেম? ঐ লোকটা—তার কি এতই দাম যে তুমি আর আমি তাকে নিয়ে এত সময় নষ্ট করতে পারি?'

শেষের কথাগুলো ভাস্করের মনে লাগলো। শিথিল হ'য়ে এলো তার শরীরের রেখাগুলো। এমিলিয়ার এক হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে: 'এত যন্ত্রণা—তোমাকে ভালোবাসি বলেই এত যন্ত্রণা, এমিলি।'

কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সে নিজের মুখে এমিলি নাম উচ্চারিত হ'তে শুনলে, তার আবার মনে পড়ে' গেলো প্রদোষ ঘোষকে। মনে পড়লো সেই স্থূল, আত্ম-প্রীত মুখ, সেই নির্ব্বোধ হাসি, কণ্ঠস্বরের সেই স্থূল মাধুর্য্য। তাড়াতাড়ি সে হাত সরিয়ে নিলে। এক হাত রাখলে কপালের উপর, যেন কোনো অশুভ আবির্ভাবকে বিতাড়িত করতে। তারপর, নিজের যন্ত্রণার লজ্জায় নিজেই অভিভূত হ'য়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা কুশানের মধ্যে মুখ লুকোলে।

এমিলিয়া নিচু হ'য়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলো, অর্দ্ধস্ফুট গুঞ্জনে, যেন নিজেরই মনে মনে:

'বোঝো না কেন? বোঝো না কেন? আমি তোমার। আমি তোমার। আমার সমস্ত জীবন তোমার। আমার মৃত্যু তোমার। তুমি মুখ তোলো। তুমি আমার দিকে তাকাও। আমাকে ভালোবাসো। তুমি ভালো না বাসলে আমি যে বাঁচবো না।'

ভাস্কর কুশান থেকে মুখ তুলে আহত, আর্ত্তদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো।—'তুমি কখনো—তুমি কখনো—'

এমিলিয়া বললে, নিতান্ত সহজভাবে: 'কখনো নয়, কখনো নয়।'

আর হঠাৎ, তার স্বচ্ছ, উজ্জ্বল চোখের নিষ্কম্প দৃষ্টিতে ভাস্কর বিশ্বাস দেখতে গেলো। শান্তি নামলো তার মনে দিগন্তে সন্ধ্যার মত। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে' সে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলো তার প্রিয়ার চোখের দিকে। কেউ কোনো কথা বললে না। তারপর হঠাৎ এমিলিয়ার দু'পায়ের মাঝখানে সে মুখ চেপে ধরলো। বলে' উঠলো, 'ক্ষমা করো।' এমিলিয়ার দু'পা সে চুম্বনে-চুম্বনে আচ্ছন্ন করে' দিলে। এমিলিয়া বসে' রইলো স্তব্ধ হয়ে। 'আমার জানা উচিত ছিলো, বোঝা উচিত ছিলো', সে বলতে লাগলো। 'আমি পাগলের মত ব্যবহার করেছি, আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো—তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি আমি নিজে। আর এই-সব—তা তোমাকে ভালোবাসি বলে'ই। এমিলি, তোমাকে ভালোবাসি।' বলতে-বলতে ভাস্করের ওষ্ঠাধর এমিলিয়ার প্রতি অঙ্গুলিবৃন্তে, হাতে, বাহুতে, উভয় বক্ষে, বক্ষের উপত্যকায়, কণ্ঠে, চিবুকে চুম্বন ছড়াতে-ছড়াতে চলে' গেলো।

এমিলিয়া পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজলো। বললে, 'মনামি।'

তারপর দু'জনের ঠোঁট বাসনার হিংস্র চুম্বনে সম্মিলিত হ'লো।

উন্মাদনার মত কয়েকটা দিন কাটলো। তারাও যেন পরস্পরকে এমন হিংস্রভাবে কখনো ভালোবাসে নি। তাদের প্রেম বিশ্বকে গ্রাস করে' নিলে। বাসনার ক্ষয় নেই, আনন্দের শেষ নেই। প্রতি মুহূর্ত্ত প্রেমের নতুন-কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটিত করছে। প্রতি মুহূর্ত্তে নতুন-কোনো ভঙ্গী, নতুন-কোনো আদর। তারা প্রেমকে পান করলে শেষ তলানি পর্য্যন্ত, প্রেমকে নিঙড়ে নিলে নিঃশেষে—যতক্ষণ না তাদের নিজেদেরই বুক ব্যথায় টন্‌টন্ করে' উঠতো। আঃ—তবু কি এর শেষ আছে! প্রেমের ইন্ধন প্রেম; আগুন আগুনকে উজ্জীবিত করে' তোলে। আনন্দ নিজকে সৃষ্টি করে' যায় মুহূর্ত্তের সঙ্গে মুহূর্ত্তের সংযোজনায়। আ—এ সহ্য করা যায় না, এ যন্ত্রণার মত। যন্ত্রণার মত, মৃত্যুর মত।

ক্রিসমাস এসে পড়লো। সহরের উৎসব-বেশ। সন্ধ্যাবেলা, কোনো রেস্তোরাঁর ভিতরে বসে' কি ট্যাক্সি দিয়ে যেতে-যেতে চৌরঙ্গির আলোর মালার দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া মনে-মনে বলেছে :

'কলকাতা এত সুন্দর—এখানে সে আমাকে ভালোবাসে বলে'।'

রোজই তারা একত্র হতো—দীর্ঘ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো একসঙ্গে। বিচ্ছেদ প্রতিবারই মর্ম্মান্তিক। দরজার কাছে গিয়েও এমিলিয়া ফিরে-ফিরে এসেছে, আর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—'না, পারিনে—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারিনে।' শেষটায় নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জোর করে'। এই বিচ্ছেদ তারা শুধু এই ভেবে সহ্য করতে পারতো যে কালই আবার দেখা হবে। একটু পরেই বিচ্ছেদ হ'য়ে উঠতো প্রতীক্ষা।

তাদের সাবধানতা অনেকটা শিথিল হ'য়ে এসেছিলো—বাইরে একত্র বেরুতে তারা আর ভয় পেতো না। বিকেলে এমিলিয়া আসতো—শীতের সোনালি-উষ্ণ, সংক্ষিপ্ত বিকেলে। চা খেতো তারা একসঙ্গে। তারপর সন্ধের পরে বেরুতো—বেড়াতো, তারপর একসঙ্গে ডিনার কোনোখানে। কোনোদিন তারা যেতো কোনো বিখ্যাত জায়গায়, যেখানে দলের লোকদের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে, নেহাৎই মুখ রাখবার জন্যে। তাদের সঙ্গে একেবারে দেখা না হওয়াটা কিছু কাজের কথা নয়। কোনোদিন খেতে যেতো অখ্যাত কোনো রাস্তার উপর অখ্যাত কোনো রেস্তোরাঁয়—ফিরিঙ্গি মালিক সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতো তাদেরকে দেখে, কী করে' যে যথেষ্ট আপ্যায়ন করবে ভেবে পেতো না। সে তার সব চেয়ে ভালো মদ বার করে' আনতো—একটু গর্ব্বিত, একটু লজ্জিতভাবে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু অতিথিদের মুখের ভাব দেখে মনে হ'তে পারতো তারা স্বর্গের সোমরস পান করছে। এমিলিয়া হাসতো ছেলে মানুষের মত। আ—কী ভালো লাগতো তাদের সেই ছোট, দরিদ্র দোকানে বসে' সাধারণ খাদ্য, সাধারণ মদ।

আর তারা ছিলো সুখী—পরস্পরের মধ্যে নিঃশেষে, সম্পূর্ণরূপে সুখী। এত সুখী তারা জীবনে কখনো হয়নি। আর এই সুখের কেন্দ্র পরস্পরের মধ্যে; পরস্পর নিমগ্ন, সমস্ত পৃথিবীকে তারা ভুলে' গেলো। সমস্ত বিশ্বে একজনের শুধু আর-একজন আছে। আর-কিছু নেই।

একদিন দুপুরবেলা ভাস্কর গেলো ডালহাউসি স্কোয়ারে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে। ব্যাঙ্ক থেকে রাস্তায় বেরিয়ে প্রদোষ ঘোষের সঙ্গে দেখা। প্রদোষই আগে কথা বললে : 'গুড্-ডে।'

ভাস্কর ফিরতি সম্ভাষণ করলে। প্রদোষের দিকে তাকাতে আজ আর যেন তার বিতৃষ্ণা হ'লো না। আর, যা-ই বলো, দিনের আলোয় আর বালু-রঙের ফ্ল্যানেলের স্যুটে তাকে ঢের বেশি ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে।

কয়েক পা দু'জনে একসঙ্গে হাঁটলে। তারপর প্রদোষ বললে, 'আপনার কি এখন একটু সময় হবে?'

'যতক্ষণ না একটা খালি ট্যাক্সি এসে পড়ে।'

প্রদোষ একটু ইতস্তত করে' বললে, 'যদি কিছু মনে না করেন—আমি ভাবছিলুম কোথাও গিয়ে এক কাপড় লাঞ্চ খেয়ে আসবো—আপনি কি দয়া করে' সঙ্গে আসবেন?'

'I 'm afraid—' ভাস্কর আরম্ভ করলে।

'Oh, do come,' প্রদোষ প্রায় মিনতির সুরে বলে' উঠলো।

ভাস্কর ঘড়ির দিকে তাকালে। একটা-সাতাশ। দুটোর সময় এমিলিয়া আসবে। তাকে বসিয়ে রাখলে চলবে না।

সে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লে।—'আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে এক্ষুনি।'

'Oh, come!' প্রদোষ ভাস্করের কাঁধের উপর মৃদু একটা টোকা দিলে। 'We won't be two minutes. Please!' সে প্রায় তাকে হাত ধরে' টানলে। তার চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ শরীরের সঙ্গে কী বেমানান এই ছেলে-মানষি কথা আর ধরণ। কিন্তু এর মুখটা ছেলেমানুষি, ভাস্কর ভাবলে। এর মুখের কোনো অতীত নেই, তা কিছু মনে রাখে না। ছেলেমানুষ, সত্যি বলতে। একে উপলক্ষ্য করে' সেদিন যে ঝড় সে তুলেছিলো তা ভেবে নিজের কাছেই সে লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। তার হৃদয় একটু এগিয়ে গেলো এর প্রতি। তাকে ইতস্তত করতে দেখে প্রদোষ বললে :

'I should be very happy if you come. Don't disappoint me'. আর সে মৃদু, নরম চোখ মেলে' ভাস্করের দিকে তাকালো। লোকটি যাকে বলে অত্যন্ত দিলখোলা, অত্যন্ত ভালোমানুষ। অতি অনায়াসেই মিশে যেতে চায়, অতি সহজেই ভাব করতে চায়। নিজকে চেপে রাখতে পারে না, চেপে রাখবার মত কিছুই নেই বলে বোধ হয়। বেশিক্ষণ দূরত্ব বজায় রাখতে পারে না—বোধ হয় এর দূরত্ব আর সায়িধ্য দুই-ই সমান অর্থহীন বলে'।

ভাস্কর এড়াতে পারলে না। দু'জনে গেলো পেলিটিতে। একটু মাছ চাখলো, তারপর এক বোতল বিয়ার। কথা বললে প্রদোষ একাই। ইস্কুল-পালানো ছেলের মত সে ফুর্ত্তিবাজ। কথার মাঝখানে হঠাৎ সে থেমে গেলো। বিয়ারে চুমুক দিয়ে বললে :

'আপনাকে জোর করে' এনে ভালো করিনি। আপনার ভালো লাগছে না।'

'আপনার ভালো-লাগা দেখে ভালো লাগছে।'

'আপনি চুপ করে'ছিলেন এতক্ষণ।'

'আপনার কথা শুনছিলাম।'

'হ্যাঁ,' প্রদোষ একটু হেসে উঠলো, 'কথা কইতে আমি ভালোবাসি।'

'তা দেখতেই পাচ্ছি।'

প্রদোষ আবার হেসে উঠলো, আগের চাইতে উচ্চস্বরে।—'এই দেখুন না, আপনাকে জোর করে' টেনে নিয়ে এলুম তো। যদিও ভালো করে' আলাপও ছিলো না আপনার সঙ্গে। তা সকলের সঙ্গেই তো কখনো প্রথম আলাপ হয়।'

ভাস্কর একবার আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে-কথা সত্যি।'

'তাছাড়া, দেখুন, আপনি আমার একেবারে অপরিচিত তা বলা যায় না। আপনি এমিলির বন্ধু। সুতরাং আপনি আমারও বন্ধু।'

মুহূর্ত্তের জন্য, ভাস্করের হৃৎপিণ্ড যেন সঙ্কুচিত হ'লো। তারপর বিস্ফারিত হ'য়ে রক্ত ছড়িয়ে দিলে তার সমস্ত শরীরে, সমস্ত মুখে। প্রদোষ কিছু লক্ষ্য করলে না, বলতে লাগলো :

'এমিলি—ও কেমন আছে? কী করছে আজকাল? সেদিন গিয়েছিলুম ওদের বাড়ি—ও ছিলো না। ওর মা বললেন, ও প্রায়ই আজকাল বাড়ি থাকে না। আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়?'

ভাস্কর ঢোঁক গিলে বললে : 'হয় মাঝেমাঝে।'

'Is she happy?' প্রদোষ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

বিজড়িত অস্পষ্টস্বরে ভাস্কর বললে, 'আমি কী করে' জানবো।'

'কিছু মনে করবেন না,' প্রদোষ তাড়াতাড়ি বলে' উঠলো, 'কথাটা এমনি বলে' ফেলেছিলুম। আমার মনে পড়ে, অস্থিরতার অসীম ক্ষমতা ছিলো ওর। তিন বছর আগে—আমি যখন কলকাতায় থাকতুম। তারপর সেদিন ওকে দেখলুম আপনার সঙ্গে—যেন অন্য-কেউ। চোখ ঝলসে গেলো।' একটু থেমে সে গভীর এক চুমুক বিয়ার খেয়ে নিলে. 'সত্যি, এত সুন্দর আমি ওকে কখনো দেখিনি। এত সুন্দর ও ছিলো না—তিন বছর আগে।' তার চোখের দৃষ্টি একটু অস্পষ্ট হয়ে এলো; তার মুখ—ভাস্করমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো—তার মুখের চেহারা বদলে গেছে, সুন্দর হয়ে উঠেছে, এমন কি। 'তারপর', প্রদোষের কথাবার্ত্তা একটু অসংলগ্ন হ'য়ে এলো, 'তারপর আমাকে কেটে পড়তে হ'লো—লাক্ষৌ, ম্যাড্রাস—damned holes!' সে সংক্ষিপ্ত এক হাসি নির্গত করলে, 'পেটের দায়ে মানুষকে কী না

করতে হয়? কিন্তু কলকাতাকে আমি কখনো ভুলতে পারবো না, কলকাতাকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। She has bewitched me.' তার মুখ একটি হাসিতে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো, যা সত্যি সুন্দর। ভাস্করের চোখের তারা পাথর হ'য়ে গেলো। 'Well!' বিয়ারের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে প্রদোষ বলল, 'well!' আপনার অনেকক্ষণ দেরি করে' ফেললুম—অপরাধ নেবেন না।

বাইরে, শীতের অজস্র উজ্জ্বল রোদ একটা কালির আঁচড়, অন্ধকার। ভাস্করের চোখের পাতা কয়েকবার ওঠা-পড়া করলো। 'ঈশ্বর,' মনে-মনে সে বলে, 'ঈশ্বর!' একটা বিশাল অন্ধকারের সে কেন্দ্র। কঠিন, উত্তপ্ত, নিষ্ঠুর অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার মাঝে-মাঝে লাল হ'য়ে উঠছে। রক্তের মত। তার রক্ত। উজ্জ্বল-লাল, লাল আপেলের মত। বাসনার সেই চিরন্তন ফল—ঘৃণার মত উজ্জ্বল। কঠিন নিষ্ঠুর উত্তপ্ত ঘৃণা। ভাস্কর অন্ধ হয়ে গেলো। অন্ধভাবে উঠে বসলো একটা ট্যাক্সিতে। একটা দোকানের ঘড়ি চোখে পড়লো—ছটো-বাজে। দেরি হ'য়ে গেছে—সে এসে বসে' থাকবে। আর হঠাৎ তার মনে হ'লো :

'সে আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে।'

আর সারাপথ, যেন মূর্চ্ছার মধ্যে অর্দ্ধ-উচ্চারণ করে' সে বলতে লাগলো :

'সে প্রতারণা করেছে। সে মিথ্যে কথা বলেছে। ঐ লোকটাকে সে ভালোবাসতো। আমি জানি। তা না হ'লে হঠাৎ তার হাসি অমন সুন্দর হ'য়ে উঠবে কেন?'

আর তারপর, নির্ব্বোধের মত, বার-বার :

'সে নিথ্যে বলেছিলো—আমার কাছে সে মিথ্যে বলেছিলো।'

বসবার ঘরে একটা চেয়ারে এমিলিয়া বসে', স্তব্ধ, একাগ্র, হাতের উপর থুতনি রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে'। 'সে আরাম করে' বসেনি পর্য্যন্ত', ভাস্কর মনে-মনে বলল, 'যে-কোনো লোক এখন তাকে দেখে বলবে যে সে আমাকে ভালোবাসে।'

ভাস্করকে দেখে এমিলিয়া উঠে দাঁড়ালো। রূপালি শাড়ি ঝল্‌মল্‌ করে' উঠলো তার সারা গায়ে। 'চোখ ঝলসে যায়,' ভাস্কর মনে-মনে বললে, 'এমন সুন্দর। সে ঠিকই বলেছিলো।'

এমিলিয়া তার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'এত দেরি করলে কেন?'

ভাস্কর ডিভানের মধ্যে ডুবে গেলো। কোনো কথা বললে না। এমিলিয়ার দিকে তাকালে না পর্য্যন্ত। 'তুমি যতক্ষণ আসো নি'—কিন্তু তার প্রেমাস্পদের মুখের দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া হঠাৎ থেমে গেলো। সে-মুখ আর চেনা যায় না। ম্লান, মৃত্যুর মত ম্লান। এক গোছা চুল স্খলিত হ'য়ে পড়েছে ভুরুর উপর। দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর। তার চোখের কালো তারা যেন কোনো চরম ভয়াবহতায় চিরকালের মত স্থির হ'য়ে গেছে। তার এক হাত পাঞ্জাবির গলার বোতামটা নিয়ে যান্ত্রিকভাবে নাড়াচাড়া করছে, নিজেরই অজান্তে।

এমিলিয়া ভয় পেয়ে গেলো। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা অর্দ্ধ-স্ফুট চীৎকার। ছুটে গিয়ে সে বসলো ভাস্করের পাশে। তার এক হাত তুলে নিলে নিজের হাতের মধ্যে।

—'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' উদ্বেগে তার কণ্ঠস্বর দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেলো, 'তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন?'

ভাস্কর তার হাত সরিয়ে নিলে, কিছু বলিলে না।

আর হঠাৎ, এমিলিয়ার হৃৎপিণ্ড যেন জমে' বরফ হ'য়ে গেলো। আ—সে মরে' যাবে, মরে' যাবে। ভাস্কর যদি তাকে আর ভালো না বাসে, সে বাঁচবে না। সে মরবে। কিন্তু এখনই! এখনই কি তাকে মরতে হবে!

সে একটু দূরে সরে' গেলো। মৃদুস্বরে, অত্যন্ত দীনভাবে, প্রার্থনার মত করে' সে বললে :

'কী হয়েছে? কী হয়েছে আমায় বলো।'

তবু ভাস্কর মুখ ফেরালে না। এমিলিয়া আবার বললে : 'বলো—বলো—চুপ করে' আছো কেন? তুমি কি আমায় কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলবে?'

তবু ভাস্কর নীরব। তখন এমিলিয়া ডিভান থেকে নেমে মেঝের উপর স্তূপ হ'য়ে ভেঙে পড়লো; মিনতিময় চোখ ভাস্করের দিকে তুলে বললে, 'তুমি এত নিষ্ঠুর! তোমার কি দয়া হয় না?'

তখন ভাস্কর বললে, এমিলিয়ার দিকে না তাকিয়ে : 'প্রদোষ ঘোষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো।'

অনেক, অনেকক্ষণ এমিলিয়া পড়ে' রইলো স্তব্ধ, নিশ্চল হ'য়ে। তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো। এর পর যখন সে কথা বললে, তা যেন অন্য কারো কণ্ঠস্বর।

—'সে কি তোমাকে—কিছু বলেছে?'

'আমি জানতে পেরেছি।'

'জানতে পেরেছো?' মূঢ়ের মত এমিলিয়া পুনরাবৃত্তি করলে।

'তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলে। তুমি তাকে ভালোবাসতে।'

এমিলিয়া আবার ডিভানে এসে বসলো; সোজা তার সামনের দিকে তাকিয়ে, যেন বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে' বলতে লাগলো :

'তুমি যদি সব জানতে তা হ'লে তুমি ও-কথা বলতে না। আমি দুর্ব্বল, আমি তোমার কাছ থেকে লুকিয়েছিলুম। আমাদের সুখেরই জন্য। আমাদের সুখকে আমি নষ্ট করতে চাইনি—এই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে। তুচ্ছ, তুচ্ছ। ওতে কি কিছু এসে যায়? ও কিছু নয়; ও লুকোবারও যোগ্য নয়। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলুম—তোমার—আমার সুখের কথা ভেবে ভয় পেয়েছিলুম। আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু এখন আমি তোমাকে সব বলছি—ছাখো।'

কিন্তু ভাস্কর শুধু বললে : 'তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলে।'

'শোনো : একটা সময় ছিলো যখন—হ্যাঁ, যখন আমি ওকে—ভালোবেসেছিলাম। না, ভালোবাসি নি; তখন মনে করেছিলুম যে ভালোবাসছি। ভালোবাসা কী, তোমাকে পাবার আগে আমি কেমন করে' জানবো? তোমার কাছ থেকে আমি প্রথম ভালোবাসার মানে জানলুম। তুমি যতদিন আসোনি—কেমন করে' ভালোবাসবো? আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি নি।'

ভাস্কর আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লে; বললে :

'ও তোমার কাছে তা-ই ছিলো—এখন আমি যা।'

'না—না। এ-কথা তুমি কী করে' বলো? এ-কথা তুমি কেমন করে' বললে? তুমি আমার কাছে যা—আর-কেউ তা হ'তে পারে না। কখনো হয়নি, কখনো হবে না। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসিনি।'

তারপর, তবু তার প্রিয়তমকে বিমুখ, নীরব দেখে :

"শোনো। আমি একা ছিলুম—ওঃ, মনামি,' নিজের অজান্তে তার মুখ দিয়ে প্রিয়-সম্বোধন বেরিয়ে পড়লো, "ভয়ানক একা। আমি ক্লান্ত ছিলুম, আমার জীবনে কিছু ছিলো না। মনামি, তখন তুমি কেন আসতে পারলে না, কেন তুমি এত দেরি করলে? আমার তোমার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিলো, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি—ভাবতে পারিনি—চারদিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো, জীবনের কিছুই দেবার নেই। যে জীবন আমাকে ক্লান্ত করে' তুলছিলো। সে এসেছিলো—আমি তাকে নিয়েছিলুম। তা ছাড়া আর কী করতে পারতুম? সময় যে কাটে না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়, তার কি কোনো মানে আছে? আমার পক্ষে তা শূন্য—শূন্য—কোনো মানে নেই। তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসিনি!'

'তুমি মিথ্যে বলছো, তুমি মিথ্যে বলছো।'

এমিলিয়ার চোখ জলে ভরে' উঠলো।—'কেন তুমি আমাকে অমন করে' কষ্ট দিচ্ছো? বোঝো না কেন? তুমি কি বুঝতে পারো না? তোমাকেই আমি ভালোবাসি। কী করে' অন্য কাউকে কখনো ভালোবাসতে পারতুম। সেটা—সেটা ভালোবাসা নয়। বুঝতে পারো না? আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো, আমি বাঁচবো না।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে, এখনো মিথ্যে বলছো।'

এমিলিয়ার চোখ দিয়ে দরদর করে' জল পড়তে লাগলো। যন্ত্রণায় রুদ্ধ স্বরে ভাঙা-ভাঙাভাবে সে বলতে লাগলো :

'কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে। তুমি নিজ মুখেই তা অনেকবার বলেছো। এ-ও কি সম্ভব যে এরই মধ্যে তোমার ভালোবাসা শেষ হ'য়ে গেলো? তুমি কি

আমাকে আর ভালোবাসো না? তুমি কি আমার মুখের দিকে আর তাকাবে না। কী করে' থাকবে? কী করে' থাকবে তুমি?' বলতে-বলতে সে ভাস্করের কাছে সরে' এসে নিজকে তার গায়ের সঙ্গে চেপে ধরলো।

কিন্তু তবু ভাস্কর মুখ তুলে তাকালো না। আস্তে ঠেলা দিয়ে এমিলিয়াকে সরিয়ে দিলে। বললে:

'না—তুমি যাও।'

'আমাকে থাকতে দাও—আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও। আমায় তোমাকে ভালোবাসতে দাও।'

ভাস্কর বললে, মেঝের উপর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে: 'তুমি যাও—তুমি যাও।'

আর এমিলিয়া বিড়বিড় করে' বললে, নির্বোধের মত: 'সে আর আমাকে ভালোবাসে না।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। বিকেল হ'য়ে আসছে—এমিলিয়ার মনে পড়লো, মিসেস কার্সন এক্ষুনি চা নিয়ে আসবে। সে কি চা খেয়েও যেতে পারে না? না, তাকে যেতে হবে। তাঁকে এখনই যেতে হবে। সে তাকে চলে' যেতে বলেছে। এমিলিয়া একবার কেঁপে উঠলো।

তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। আয়নার কাছে গিয়ে চোখের কোল মুছলো, একটু পাউডার ছোঁয়ালো মুখে। তারপর, দরজার দিকে যেতে-যেতে ভাস্করের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো:

'কিন্তু আমি তোমাকেই ভালোবাসতুম।'

ভাস্করের মুখের একটা পেশী নড়লো না। এমিলিয়া আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলো। দরজার কাছাকাছি এসে:

'আমি তোমাকে ভালোবাসতুম,' সে আবার বললে, 'তুমি কি বুঝতে পারো না? তোমাকে ছাড়া কাউকে কখনো ভালোবাসি নি।'

তবু ভাস্কর নীরব, নিশ্চল। এমিলিয়া চুপ করে' একটু দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ঘরটির চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো দরজা দিয়ে।

আর সঙ্গে-সঙ্গে, ভাস্করের মধ্যে কোথায় কী-যেন একটা ছিঁড়ে গেলো। ধনুকের ছিলা এতক্ষণ সে জোর করে' কানে-কানে টেনে রেখেছিলো, এইবার পড়লো ভেঙে। সে ভেঙে পড়লো। সে আর পারে না; সে ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত। সীমাহীন, চিরন্তন এক ক্লান্তি তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তবু তারই মধ্যে তার মনের উপর দিয়ে একবার খেলে গেলো:

'তাকে আর কখনো দেখবো না।'

কিন্তু সে ভাবতেও পারে না—সে এত ক্লান্ত। সে এখন ঘুমুবে। ঘুম। ঘুম। ঘুম, মৃত্যু। ঘুমকে তোমরা কামনা করো, আর মৃত্যুকে তোমরা ভয় পাও। অথচ ঘুমও তো মৃত্যু। আ—ঘুম যদি মৃত্যু হ'তো। যদি সে ঘুমিয়ে পড়তো, আর না জাগতো।

সে উঠলো। টলতে-টলতে গেলো শোবার ঘরে, নিজেকে ছুঁড়ে ফেললো তার বিছানার উপর। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার ঘুম যখন ভাঙলো, ঘর প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। প্রথমটায় সে যেন কিছুই ঠাহর করতে পারলে না। এত অন্ধকার কেন? এ-সময়ে সে কেন শুয়ে আছে? তারপর তার মনে পড়লো। সে আবার চোখ বুজতে যাচ্ছে, হঠাৎ তার চোখে পড়লো এমিলিয়ার মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে। একটু তাকিয়ে থেকে সে বুঝতে পারলে, সে স্বপ্ন দেখছে না।

এমিলিয়া মৃদুস্বরে বললে, 'কত ঘুমোবে?'

ভাস্কর দু'হাত বাড়িয়ে তাকে তার বুকের উপর টেনে আনলো। বললে:

'জানতুম তুমি ফিরে আসবে।'

এমিলিয়া বললে, ভাস্করের মাথার পাশে বালিশের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে:

'আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি? আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে পারি?'

'এমিলি—আমি যা কষ্ট পেয়েছি—'

'থাক্,' এমিলিয়া ভাস্করের মুখের উপর হাত রেখে বললে, 'ও-কথা থাক্। বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

এমিলিয়া ভাস্করের ঠোঁটের উপর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তারপর অস্ফুট গুঞ্জনে বললে : 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

তারপর অন্ধকার। তারপর স্তব্ধতা। তারপর রক্তের সমুদ্রের বিশ্ব-অবলোপকারী বন্যা।

আর তারপর, সেই বন্যা যখন তাদেরকে রেখে গেলো বাসনা-বেলার উপর অলস, অসহায়, প্রিয়তমের আত্মার নিভৃততম সৌরভে আচ্ছন্ন, এমিলিয়ার দু' চোখ জলে ভরে' উঠলো। ভাস্কর তার চোখের ভিতরে তাকালো, যেন কোনো রহস্যময় চাঁদের অন্তরে, আর জিজ্ঞেস করলে :

'কী হয়েছে, কাঁদো কেন?'

এমিলিয়া বললে, তার অশ্রুর ভিতর দিয়ে হাসতে-হাসতে :

'জিজ্ঞেস কোরো না, কাঁদতে দাও। আমাকে কাঁদতেই হবে—এত সুখ কী করে' সইবো?'

'চুপ করে' থাকো, ঘুমোও।'

এমিলিয়া চোখ বুজলো। গুঞ্জন করে' বললে, 'ভালোবাসো আমাকে ভালোবাসো—ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াও।' তারপর, চোখ খুলে, দু' আঙুল দিয়ে প্রিয়তমের অধর মৃদু স্পর্শ করে' :

'তোমার এই ঘরে আমার আর কোনো ভয় নেই। শয়তানকে তাড়াবার জন্য বিছানার নিচেই শাহারা রয়েছে।'

খানিক পরে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

আর ভাস্কর রইলো জেগে। কান পেতে শুনতে লাগলো প্রিয়তমার নিয়মিত, দীর্ঘ নিঃশ্বাস। ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছিলো, সেলেপটা টেনে এনে তাকে বুক অবধি ঢেকে দিলে। তার হাত স্পর্শ করলে তার বুক। সে তার বুকের উপর হাত রাখলে—উষ্ণ, প্রাণ-উষ্ণ, যেখানে তার জীবন স্পন্দিত হচ্ছে। তার জীবন—তার যে-জীবনকে সে এত ভালোবাসে। আ—কেন সে বুঝতে পারে নি সে তাকে কত ভালোবাসে? তার হাত চলে' গেলো তার গলার, তার মুখের, চুলের উপর দিয়ে। অতি শান্ত, অতি গভীরভাবে সে ঘুমচ্ছে।

ভাস্কর হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ্‌টা টিপলো। এমিলিয়া মৃদুভাবে একটু নড়ে' উঠলো, কিন্তু তার ঘুমে আঁচড় পড়লো না। আর ভাস্কর সেই ঘুমোনো মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, অনেক, অনেকক্ষণ ধরে'। ঈশ্বর, কে জানতো আমি ওকে এত ভালোবাসি?

এমিলিয়ার ঠোঁট একটু নড়ে' উঠলো, অস্ফুটস্বরে সে বললে, 'মনামি'।

আর হঠাৎ, শান্তির দ্বীপের মত এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে, ভাস্কর মন ঠিক করে' ফেললো। এ-ই তো মুহূর্ত্ত, এ-ই তো চরম মুহূর্ত্ত। সে আমার কাছে এসেছে; সে কখনো আমাকে এর বেশি ভালোবাসবে না—আমি কখনো তাকে এর বেশি ভালোবাসবো না। আর কেন—আর কেন তবে? এই মুহূর্ত্ত শেষ হোক্, এই মুহূর্ত্ত চিরন্তন হোক। এই মুহূর্ত্ত চিরকাল হোক্।

ভাস্কর ঝুঁকে পড়ে' এমিলিয়ার মুখ দেখতে লাগলো। আ—ঘুমের মধ্যে সে হাসছে। ঘুমের মধ্যেও সে ভাবছে তার কথা। সে তাকে ভালোবাসে, তে তাকে ভালোবাসে! এই প্রেমকে সে চিরন্তন করবে। এই প্রেমকে সে নষ্ট হ'তে দেবে না। এই প্রেমকে সে কালকের দিনের ভাঙাচোরায় লুটিয়ে পড়তে দেবে না। আ—কাল। কাল যদি প্রেম না থাকে? যদি কখনো, যদি কখনো—ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না, আর কষ্ট দিয়ো না।

সে তার বুকের মৃদু ওঠা-পড়ার দিকে তাকালো। এই আন্দোলন, প্রতি মুহূর্ত্তের এই হৃৎ-স্পন্দন—এ তারই জন্য, তারই ভালোবাসায়। স্তব্ধ করে' দাও; স্তব্ধ করে' দাও। পরিবর্ত্তনের অতীত, বিস্মৃতির অতীত, সময়ের অতীত করে' দাও, এই ভালোবাসাকে। কেন আমরা আর ছুটে পেতে যাবো? আলো ওর চোখে লাগছে : আলো নিবিয়ে দাও, আলো নিবিয়ে দাও—অসীম অন্ধকারে চিরকালে কল্লোলিত এই প্রেম।

তার দু' হাত এমিলিয়ার গলার উপর এসে পড়লো। প্রিয়স্পর্শে ঘুমের মধ্যেও এমিলিয়ার মুখে হাসি ফুটলো। সে তাকে এত ভালোবাসে—সে কী করে' তা সইবে? কী করে' তার পরিতৃপ্তি করবে? কিছুতেই, কিছুতেই সে তাকে যথেষ্ট ভালোবাসতে পারবে না। সমস্ত আত্মার সমস্ত ভালোবাসাও যথেষ্ট নয়। মাংসের শৃঙ্খল বাধা দেয়; যা সীমাহীন, যা আদিম অন্ধকারের মত অনির্ব্বচনীয়, মাংসের

শৃঙ্খল তাকে খর্ব্ব করে' তোলে, পরিমিত করে' তোলে। সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলো।

গভীর, গভীর প্রেমে তার আঙুলগুলো প্রিয়তমার গলার মাংসে বসে' যেতে লাগলো। নীল, সূক্ষ্ম শিরাগুলো ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো। আ—এতক্ষণে, এতক্ষণে পরিপূর্ণতা। সর্ব্বশেষ সমাপ্তি। এমিলি, এখন আর আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? চিরকাল, চিরকাল তুমি আমাকে ভালোবাসবে। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে নয়। তোমার জীবন আমার দু' হাতের মধ্যে। আ—এতক্ষণে তোমাকে আমি সম্পূর্ণ করে' পেয়েছি, তোমার জীবনকে পেয়েছি দু' হাতের মধ্যে। এখন আর আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?

এমিলিয়ার বিস্ফারিত, রক্তাভ চোখ হঠাৎ মেলে গেলো একটা প্রশ্নের মত। তার চোখ লুব্ধ, ভাস্কর মনে-মনে বললে, 'রক্ত!' তার মুখ খুললো, সে বোধ হয় কিছু বলতে চাইলে—বলতে পারলে না। একটা অস্পষ্ট, চাপা আওয়াজ শুধু বেরুলো। আর তার মুখ আরো, আরো খুলে যেতে লাগলো। 'কী সুন্দর ওর দাঁত,' ভাস্কর ভাবলে।

এমিলিয়া ছট্‌ফট্ করতে লাগলো, হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। আ, ওর কষ্ট হচ্ছে। ভাস্কর তার দু' হাঁটু তুলে দিলে তার বুকের উপর! একটা অদ্ভুত শব্দ হ'লো—যেন তার শরীরের মধ্যে কোথাও কিছু ভেঙে গেলো। তারপর আস্তে-আস্তে সে শান্ত হ'য়ে আসতে লাগলো। তার সমস্ত মুখ বিকৃত, বীভৎস হ'য়ে গেলো।

কিন্তু ভাস্কর সে-মুখের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে রইলো, আর মনে-মনে বললে:

'এখন সে আমায় চিরকাল ভালোবাসবে।'

অঙ্গ বর্ণে সৌন্দর্য্য সম্পাত করিতে "অঙ্গরাগ" সাবানের তুলনা নাই। অঙ্গরাগ সাধারণ সাবানের ন্যায় অঙ্গের কোমলতা নষ্ট করে না—ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

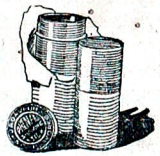

ফেনকা শেভিং ষ্টিক

ফেনকার সুরভিত ফেনপুঞ্জ ক্ষৌর-কর্ম্মে সত্যই আনন্দ দান করে। যিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ষ্টেশনারের কাছে যদি না পান, আমাদের চিঠি লিখিতে বলুন।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্

২৯নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

দোলা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ডায়ারির মধ্য পর্ব্ব!···

কয়েক পাতা পরেই:

"আজ সিসির চিঠি এল পোর্ট সেড থেকে। যাক্ তবু ভালো যে অত দ্রুত পট পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এ-প্রতীক্ষমানার নিষ্ফল প্রত্যাশার বেদনা নিয়ে সে কবিত্ব করার সময় পাচ্ছে।—তবু আশঙ্কা হয়। কিন্তু কিসের আশঙ্কা। দূর্। সত্যিই বুঝি মেয়েরা একটু বেশি উচ্ছ্বাসিনী। উচ্ছ্বাস—বুঝি। কিন্তু এ অহেতুক ভয় কেন? দুরু দুরু বক্ষ, অতন্দ্রিত উৎকণ্ঠা, বিনিদ্র রজনী—এসব রোমান্সে শুনতে বেশ—কিন্তু জীবনে? না, ও আমি চাই না। এ-অহেতুক উৎকণ্ঠার মূল আমি সবলার মতনই ফেল্‌ব উপ্‌ড়ে। অন্যের বঁধুরা কি ছাই 'আন ঘরে' যায় না? তবু তো আমার বঁধুয়া পদে আছেন—'আমার আঙিনা' বেয়ে আমার বুকের ওপর দিয়ে কোথাও যান নি। তবে? এত ভয় কেন?"

তারপরই অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত: কী উচ্ছ্বাস! উঃ···

"আমার স্বামীর মতন স্বামী কার? রূপে গুণে স্বভাবে—"স্বপন সন্ধ্যার স্নানের ঘরের দিকে তাকায়। মনটা আর্দ্র হ'য়ে ওঠে কিন্তু। আশ্চর্য্য! ও জানে যে এ নিছক্ অকাব্যিক ফেনা···কোনোদিন এ কয়টি লাইন দিয়ে মেঘদূত রচিত হবে না রোমিও-জুলিয়েটও না। তবু—ভালো লাগে। সন্ধ্যা ওকে এত ভালোবাসে? এত বিশ্বাস করে? কোথায় একটা ব্যথাও যেন ওঠে বেজে।

তবু তাড়াতাড়ি পাতা উল্‌টে যেতে হয়। এসব ভালো লাগ্‌লেও পড়ার সময় কই? কি জানি কখন সন্ধ্যার দোর খোলার আওয়াজ হয়? Make hay while the sun—

পরের কয়েক পাতায় বাড়ীর খবর···তার ফরাসী দেখার ইচ্ছে হওয়ার কথা···রুমুর ঠাট্টার উল্লেখ···আরও কত জল্পনা কল্পনা···মাঝে মাঝে দুএকটি কবিতার অসম্পূর্ণ স্তবকও:

তোমায় পেতাম যেদিন হাত বাড়ালে
তালে তালে
বনস্থলী
ফুলাঞ্জলি
চাল্‌ত মুঠো-ভরে···
শুধু নেইক ব'লে কাছে তুমি
আজ কুহু'মি'
ওঠে না দিন
বাজে না বীণ
ধরার কলস্বরে।

কী সুন্দর লাগে একয়টি লাইন—ডায়ারির স্নিগ্ধ পট ভূমিকায়। যেন ধূসর সন্ধ্যার বুকে ফুলের মতন জ্ব'লে উঠ্‌ল কয়টি তারা!···হঠাৎ স্বপনের মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে কবিতার সঙ্গে তার ইতিহাসের—কন্‌টেক্সটের আবেষ্টনীর যে সম্বন্ধ সেটুকু জান্‌লে কি কবিতার রসভোগ বেশি সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না? যদি জানা যেত রজকিনীর সঙ্গে কোন্ কোন্ দিন কী কী আদর সোহাগের অশ্রু হাসির পরে চণ্ডীদাস কোন্ কোন্ পদ লিখেছিলেন? রজকিনীর কোন্ অসহ বেদনার দোলে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছিল:

শুন হে চিকণ কালা!
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা?
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ,—
কভু কোনো ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ।

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম,—
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম ঘনশ্যাম।
অবলার মত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে,—
চণ্ডীদাসে কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে।

প্রবী—রজকিনীর বেদনার ইতিহাস এসব গানের ছত্রে ছত্রে গাঁথা। তবু···নিশ্চয় ক'রে জান্‌লে এ গানগুলির রস আরও নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ত না কি?—যেমন সন্ধ্যার কবিতা-গুলি তার ডায়ারির মধ্যে। ডায়ারির মাটি থেকে উপ্‌ড়ে এদেরকে প্রকাশকের দোকানে কিনে পড়লে অনেকখানি সৌরভ কি মারা যায় না?

কয়েকপাতা পরে:

"সিসির নাপরিচিতা এ-অজ্ঞাতকুলশীলাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেন হয়?—যখন জানি সে বিলিতি মেয়ের মতন বিলিতি রকমই দেখ্‌তে হবে! সম্ভবতঃ সুরূপাও। রুক্ষমাখা, গায়ে-পড়া, চতুরা, মুখরা, রোমান্টিক-ভাবাপন্না, দরকার হ'লে গদ্‌গদভাষিনী—এসবই তো জলের মতন স্বচ্ছ। তবু দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় কেনই বা! যাঃ! তা কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো—কিন্তু তাহ'লে এত আপত্তি ঘোষণা করছিই বা কেন এ-গভীর রাতে? না না না। একথা কখনই সত্যি নয়। দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় কেন? বাঃ! হবে নাই বা কেন! ইন্টারেষ্টিং মেয়ে—আলাপ করতে ইচ্ছে হবে না! না হ'লেই তো হ'ত সেটা দোষের।"

স্বপনের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে:

"কিন্তু তবু কোথায় একটা অদৃশ্য কাঁটা!··নড়তে চড়তে খচ্‌খচ্ করে যে—অস্বীকার ক'রে হবে কী? না, এ-দুর্ব্বলতাকে দমন করতেই হবে। সিসিকে যাবার সময়ে বলিনি যে বিদেশিনীদের শুধু দেউড়ির নয় অন্দরমহলের খবরও মন্থন ক'রে এনে আমার শ্রীচরণে নিবেদন করতে হবে! ও হেসে ব'লেছিল: 'যদি বিষ ওঠে তবে কি শিবের দোসরা হবে না কি গো?'—আহা—হা। যেন বিষ শুধু পুরুষেই পরিপাক করতে পারে—নারী যেন শুধুই মঁধুবিলাসিনী। এ-অগৌরব দূর করতেই হবে আধুনিকাদেরকে।

"কিন্তু জয় একে না হয় করলামই। তবু প্রশ্নটা তো রইলই। বাজে কেন? খারাপটাই বা মনে করতে ইচ্ছে হয় কেন? আনা তো ভালো হ'তেও পারে। অভিযুক্ত আসামী আইনেও অনৈশ্চিত্যের বেনিফিট পায়—অথচ সুকুমার জগতে তাকে সরাসর দেব প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—তার সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও না জেনে? এ কী রকম কাজীর বিচার?

"নাঃ। মেয়েটি নিশ্চয়ই ভালো মেয়ে। ক'দিন আগেই নীলিমাকে লিখেছি সিসির বিচক্ষণতার কত তারিফ ক'রে। আর আজই তাকে ধ'রে নিচ্ছি বিমুগ্ধ—প্রলুব্ধ—অন্ধ? ও বলত মেয়েরা বস্ত্রভদের চায় আঁচলে বেঁধে রাখ্‌তে, তাই ছদ্মছাড়াদের এত বিপদ—একটু পান থেকে চুণ খস্‌তে না খস্‌তে তারা মেয়েদের চোখের সাম্‌নে দীপ্ত হয়ে ওঠে ক্রিমিনালের রঙে। না, ওকে আমি অবিশ্বাস করব না। না না না। তাছাড়া সত্যিই তো ওরা ধর্ম্মে ছদ্মছাড়া। ওদের বেঁধে রাখ্‌তে চাওয়াই—সেটাই যে অত্যাচার। স্নেহও ওদের সয় না—যদি লালন বড় বেশি সজাগ হয়।

"আনার সঙ্গে মিশ্‌ছে ঘনিষ্ঠভাবে। মিশ্‌লই বা যদি এতে—দূর্, ওকথা মনে স্থান দেওয়াও হীনতা। ছি। বিশেষতঃ যখন মেয়েটি এতবড় আঘাত পেয়েছে। আহা! কিন্তু আশ্চর্য্য! আহা বল্‌ছে কে?—আমার মন। প্রাণ না তো। এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধি কত বেশি বেপরোয়া, নয়? প্রাণ কত বেশি বশ—বাসনার, প্রবৃত্তির, প্রকৃতির। আচ্ছা, সত্যিই কি মেয়েরা বেশি প্রাণধর্ম্মী ব'লেই এত বেশী প্রকৃতির তাঁবে? কিন্তু বিস্ময় লাগে! আনা যদি সিসির সঙ্গে না মিশে অতন্থ, পল্লব বা নিলয়ের সঙ্গে মিশ্‌ত তাহ'লে ওর দুঃখের জন্যে আমার দরদ উঠ্‌ত উথ্‌লে। অথচ এক্ষেত্রে সিসি দরদী হ'ল ব'লেই আমি হ'য়ে উঠ্‌ছি বেঁদরদী। না—এ অসহ্য। প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল হওয়া আমাদের আর চল্‌বে না—কোনোমতেই না। অতীত যুগের মেয়েদের এ-অপযশ অবলা ব'লে এ-দুর্ণাম কাটিয়ে উঠ্‌তেই হবে এ-যুগের সবলাদেরকে। অবলা! পুরুষের কাণে ও নাম

যতই কেন না মধু বর্ষণ করুক—অবলাত্বকে শ্রী, সুষমা, কল্যাণী, লজ্জাবতী লতা প্রভৃতি বিশেষণ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা অলঙ্কার দিয়ে যতই রসে-রাঙা কবিতা রচিত হোক্ না কেন—এ সুশ্রী মাধুর্য্য অপলক্ষ্য লাবণ্যের রঙে মেয়েদের আর প্রসাধন করা চল্‌বে না—তাতে যতই কেন না তাদের রূপ শ্রী বৃদ্ধি হোক্। এক্ষেত্রে আনার সঙ্গে আমার একমত। ওর স্বামীকে ছেড়ে আসাতেও তাই আমি শ্রদ্ধা করি। নারী শুধু পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হ'য়েই থাক্‌বে না। না না না। তাকেও আগে হ'তে হবে মানুষ—তার পরে নারী। নারীর নারীত্ব! না, তা ছাড়ব কেন! যা সুন্দর সুকুমার মধুর তাতে যদি নারীর জন্মস্বত্ব বেশি থাকে তবে পুরুষালি বর্ব্বরতার অনুকরণ ক'রে তাকে খোয়ানো হবে তার মৃত্যু। এ বিষয়ে বিলিতি মেয়েদের মতন বোকা হবো কেন আমরা? না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে কখনই ঠেল্‌ব না। পুরুষের নেই এ-লাবণ্য—যা আমাদের আছে। একে বিদায় দেব কেন? নেই ওদের প্রসাধন নৈপুণ্য—আমাদের এতে জন্মস্বত্ব। ছাড়ব কেন? না, সম্পদকে ছাড়ার মানে তেজ নয়—কোনো একটা ইস্‌মের ফেরে প'ড়ে। কিন্তু তাই ব'লে মাধবীলতা সহকারকে অবলম্বন ক'রে তবেই আকাশের পানে উঠ্‌বে, নইলে পড়বে মাটিতে লতিয়ে—এ-কথা শুন্‌লেও গা জ্বালা করে। কেন না এ তো সম্বল নয়—এ হ'ল শূন্যতার পরাশক্তি, মিথ্যার আল্পনা।"

তার পরে কয়েক পাতা ফাঁক। স্বপনের উল্‌টোতে উল্‌টোতে কত কী যে মনে হয়!...সন্ধ্যা যে এত ভাবে কে জান্‌ত?—লেখা পাতা আসে:

"কিন্তু সিসির এ-অড়ষ্ট ভাব কেন? এর কী দরকার ছিল। ওর সব ঠাট্টা সব লঘু সুরই এমন বেসুরো বাজে কেন!···আমার এ ভ্রান্তি? হবে। তাই হোক্। কিন্তু ···যা প্রমাণ করতে পারি না তা-ই কি অসত্য?"

পরে কয়েকটা পাতা ফের ফাঁক। তার পরে:

"আচ্ছা, একথা ডায়ারিতে লিখ্‌তেও ভয় পাই কেন? এ-আশঙ্কা সত্যি নয় ব'লে? কিন্তু তাই যদি হবে তাহ'লে এ কথাটা উঠ্‌তে চাইলেও মনের মুখ চেপে ধরি কেন? তবে কি সত্যিই যুগ যুগের সঞ্চিত ক্ষুশ্‌লানির ফলে আমাদের মনের মূলে অবলাত্ব দৃঢ় হ'য়ে গেঁথে গেছে?—না; যদি গিয়েও থাকে—তবে তাকে ফেলব উপ্‌ড়ে—তাতে যত ব্যথাই বাজুক না কেন।

"কিন্তু তবু হৃদয়ের কোথায় একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে ছেয়ে আসে···ভরসার আলো যায় নিভে। আনার 'পরে শ্রদ্ধা যে-পরিমাণে বাড়ছে, তার ব্যথার জন্যে দুঃখ দরদ যে-পরিমাণে নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ছে—ঠিক্ সেই পরিমাণেই যে আবার হৃদয়টা উঠ্‌ছে টন্‌টন্ ক'রে। কেন এমন হয়?

"এ-কেনর চল্‌তি উত্তর আমি জানি, কিন্তু মানি না না—না—না: কিছুতেই একথা আমি স্বীকার করব না যে, এর কারণ শুধু মেয়েদের মাধবীলতা প্রবৃত্তি। আঁকড়ে থাক্‌তে চাওয়ার প্রবৃত্তি কার নেই? পুরুষেরাও কি রোগে শোকে মেয়েদের সান্ত্বনা স্নিগ্ধতার কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে না? বলে না—তোমাদের স্নিগ্ধতার অন্নপূর্ণা-অঞ্জলির কাছে আমরা হাত পাত্‌ব ও তোমরা আমাদের সব রিক্ততা, সব অভাব, সব শুষ্কতা সে-রসধারার দানে সবুজ ক'রে তুল্‌বে? না। ও একটা কথাই নয়। ভালবাসায় প্রতিদান কামনা থাক্‌তে পারে, কিন্তু তার মানেই কি প্রেমাস্পদকে শুধু গ্রাস করার ইচ্ছে? তবে সিসি এ রকম অনুদার ঠাট্টা করে কেন? বার্ণার্ড শ-র ও-ঠাট্টা তীক্ষ্ণ হ'তে পারে যে মেয়েরা পাহাড়ে সাপ—বস্ত্রভটকে আস্ত মুখে না পুর্‌লে তাদের স্বধর্ম্মই পালিত হয় না—কিন্তু তাই ব'লে ও-ব্যঙ্গ সত্য নয়। ও মিথ্যা—ও কুশ্রী! আর আজকের যুগের মেয়েরাই একথা প্রমাণ করবে। তাদের 'পরেই ভার দেখিয়ে দেবার যে মেয়ারাও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে ভালোবাস্‌তে জানে—যেমন ভালোবাসে শিল্পী তার শিল্পকে।"

হঠাৎ স্নানের ঘরের দোরের কাছে কী-একটা শব্দ হ'ল। স্বপন তাড়াতাড়ি ডায়ারিটা সন্ধ্যার হাতবাক্সে রেখে ভালো-মানুষের মতন সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে-রইল। তার বুকের মধ্যে কী-একটা তার যেন বেজে উঠেছিল।... কী সুন্দর! সন্ধ্যার প্রতি এত শ্রদ্ধা এত সম্ভ্রম বুঝি ও জীবনে কোনোদিন বোধ করে নি। এত পড়তে ইচ্ছে করে ওর মনের লাজুক কথাগুলি।··লুকিয়ে এসব পড়া যে অন্যায় তা এমন কি মনেও হয় না আর।···

কিন্তু কই, দোর তো খুল্‌ল না। বিপদ্‌ জেনেও লোভ সে সাম্‌লাতে পারল না। বড় জোর হাতে-নাতে ধরা পড়বে। এ-সব অপরাধে হৃদয়বল্লভার কাছে যে-সাজা মেলে তা খুব অরুচিকরও নয়। দেখা যাক্‌ ফের দুর্গা ব'লে।

টেনে নিয়ে ফের পড়তে লাগ্‌ল—কিন্তু খুবই সতর্ক হ'য়ে :

"কিন্তু আঁকড়ে থাকার গূঢ় প্রবৃত্তি যদি প্রেমের মূলে লুকিয়ে না থাকে তবে একথা ভাব্‌তে কেনই বা এত ব্যথা পাই যে সিসি আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে ভালোবাস্‌তে পারে? যতটা দেব ততটা ফিরে চাই এ-দরদস্তুরের ভাব যদি প্রেমের আদান প্রদানে না-ই থাক্‌বে—তবে আমার সঙ্গে সিসি এখন হয়ত প্রেমালাপ করছে ভাব্‌তেও এমন বেঁধে কেন? কতদূরে সে। আনা না থাক্‌লেই তো কিছু আমি এখন তার কাছ থেকে আমার প্রেমের প্রতিদান পেতাম না। কাছে থাক্‌লে—"আমাকে বঞ্চিত ক'রে আনাকেই দিচ্ছে সবটুকু" একথা ভেবে না হয় অনুযোগ করতে পারতাম। কিন্তু এখানে তাও তো নয়। তবে? তবে একে প্রতিদান কামনা ব'লে কাকে চোখ ঠারছি!

"না। একথা স্বীকার করতে আমার যতই বেদনা লাগুক না কেন একথা আমাকে মান্‌তেই হবে যে সিসির-প্রতি-আমার প্রেম যে-ধরণের ব'লে আমি গর্ব্ব বোধ করতাম সে-ধরণের প্রেম আমার নয়।

"এ স্বীকারে ব্যথা বাজে? বাজুক। সত্য যা তাকে সত্য ব'লে না মান্‌লে সত্যের সাধনা হবে কেমন ক'রে? আর তা-ই যদি না হয় তবে প্রেম বড় হবে কী ক'রে? প্রেমের ভিত্তি টেঁকে কখনো যদি সত্যে সে সাহস ক'রে ভর করতে না পারে? 'বাস্তবতা' কথাটা শুন্‌তে আমার কী খারাপই না লাগ্‌ত এক সময়ে! কিন্তু বাস্তবিক ও তো আদর্শের শত্রু নয়—বন্ধুই। ও-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—আদর্শের পথে কাঁটা কোথায়। ফুলস্বপ্ন কখনো জাগ্‌তে মূর্ত্ত হয় কি যদি কাঁটা সম্বন্ধে চেতনা পূর্ণ সজাগ হ'তে না শেখে?"

হঠাৎ স্নানের ঘরের দোরে ফের শব্দ হয়।.....স্বপন নক্ষত্রবেগে সন্ধ্যার ডায়ারিটা তার হাতবাক্সে রেখে দিয়ে সমুদ্রের দিকে থাকে চেয়ে।

—"কি গো ভাবুকরাজ? এতক্ষণ হচ্ছিল কি?"

—"দূরের ঐ পালতোলা নৌকাটা কী সুন্দর!"

—"ঐটে দেখ্‌ছিলে বুঝি?" সন্ধ্যার এমন ভালমান্‌সি টোন!

—"এমন প্রভাতকনককিরণোজ্জ্বল দিনে কি আর কোনো দিকে মন যায়?"

—"যায় গো যায়—কারুর হাতবাক্সে মরোকোবাঁধা কিছু থাক্‌লে বাইরে কনক তো কনক, হীরে জহরতের মেলা বস্‌লেও এসে যায় না।"

স্বপন সত্রাসে ওর দিকে তাকায়।

সন্ধ্যা খিল খিল ক'রে হেসে বলে: "এতদিন এদেশে আছ ঠাকুর, তবু জানো না যে এদের দেশের দোরে কী-হোল কাকে বলে? এ কি আমাদের দেশের দোর?"

হৈমন্তী

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বৈদেহী বিচিত্রা আজি হেমন্তের সংক্ষিপ্ত সন্ধ্যায়
প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকুতি;
অস্তগত সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেলো রজনীগন্ধায়॥

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, শীর্ণ কুঞ্জ হেমন্ত-লোহিত,
তরুণ-তরুণী-শূন্য বক্র পথ চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, সঙ্গীহারা বিষণ্ণ বলাকা,
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত॥

নীরব নশ্বর যারা, অবজ্ঞেয় অকিঞ্চন যত
তাহারা আজিকে যেন লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা।
আমার সঙ্কীর্ণ আত্মা উল্লঙ্ঘিয়া দর্শনের সীমা
ছুটিছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গের মতো॥

সহসা বিস্ময়-মৌন উচ্চ-কণ্ঠ বিতর্ক বিচার;
পরাণের ছিদ্রে ছিদ্রে পরিপূর্ণ অনবদ্য সুর।
জানি মুহূর্ত্তের মোহ শেষ হবে নৈরাশে নিষ্ঠুর,
তবু জীবনের জয় ভাষা মাগে অধরে আমার॥

যারা ছিলো একদিন, আসি বলি গিয়েছে যাহারা,
যাদের আগম-বার্তা মিছে ব'লে বুঝেছি নিশ্চয়,
স্বয়ম্ভূ সঙ্গীতে মোর তাদের তড়িৎ পরিচয়
আকস্মিক দুরাশায় থেকে থেকে করিবে ইসারা॥

ফুটিবে গাথায় মোর দুঃস্থ হাসি, সুখের ক্রন্দন,
দৈনিক-দীনতা-দুষ্ট বাঁচিবার উল্লাস কেবল,
নিমেষের আত্মবোধ, নিমেষের অধৈর্য্য অবল,
অখণ্ড-নির্ব্বাণ ভরা রমণীর চপল চুম্বন॥

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার,
আজি আর ফিরিবোনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে॥

কামিনী-কাঞ্চন

— গল্প —

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দু'জনেরই নামের শেষে 'শঙ্কর' ছিল। একজনের নাম অজিতশঙ্কর, আর একজনের নাম—কিরণশঙ্কর।

এই নামের মিলের জন্যই তাহাদের মনের মিল কিনা জানি না। তবে মিল যে তাহাদের অত্যন্ত প্রগাঢ় সেটুকু জানিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথম তাহাদের কিরকমভাবে পরিচয় হয়, এবং পরে তাহা কোন্ সূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে সেকথা আমরা অবশ্য জানি, কিন্তু আমরা যাহা জানি তাহাই যে সবসময় আপনাদের জানাইতে হইবে তাহার কোনও প্রতিশ্রুতি দিই নাই। সুতরাং সে পুরাতন কাহিনী তাহাদের দুই বন্ধুর জীবনেও যেরকমভাবে অতীতের অন্ধকারে ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেছে, তেমনিই যাক্। এখন বর্ত্তমানকে লইয়াই আমাদের প্রয়োজন। আপাততঃ সেই কথাই বলি।

অজিতশঙ্কর এবং কিরণশঙ্কর—দু'জনে এক আপিসেই চাকরি করে। কলিকাতা মহানগরীর এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ব্যারেক্ বাড়ীর পাশাপাশি দুইখানি ফ্ল্যাট্ ভাড়া লইয়া দু'জনে বাস করিতেছে। একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া দু'জনে একসঙ্গে বাস করাই তাহাদের উচিত ছিল, সেরকম একটা কথাও যে ওঠে নাই তাহা নয়, কিন্তু অজিতশঙ্কর বলিয়াছে, "না ভাই, সেটা আমি পছন্দ করি না!"

কিরণশঙ্কর বলিল, "কেন? দুটো বাড়ীর ভাড়া দেওয়ার চেয়ে একসঙ্গে একটা বাড়ীর ভাড়া দেওয়াই ত' ভালো।"

অজিতশঙ্কর হাসিয়া বলিল:

"তুই এখনও ছেলেমানুষ কিরণ। মেয়েদের ত' চিনিসনি, চিনলে একথা বলতিস না।"

কিরণশঙ্কর বলিল, "ঝগড়া করবে? কখ্খনো না।"

অজিতশঙ্কর বলিল, "নিশ্চয়ই করবে। আমার অনেক জানা আছে ভাই, তুই চুপ কর্। তার চেয়ে এ বরং আমরা ভালই আছি।"

কাজেই দেখা যাইতেছে, অজিতশঙ্করের জন্যই সে ব্যবস্থাটা হয় নাই। একই ব্যারেকে দুই বন্ধুর দুই সংসার—পাশাপাশি বাস করিতেছে।

অজিত ও কিরণ খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে আপিস চলিয়া যায়। অজিতের স্ত্রী তখন হাসিয়া বলে, "এইবার আমাদের আপিস।"

বলিয়াই সে তাহার ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া কিরণের ব্যারেকে গিয়া হাজির হয়।

কোনোদিন কিরণের বৌ আসে অজিতের বৌএর কাছে, আবার কোনোদিন-বা অজিতের বৌ যায় কিরণের বৌএর বাড়ী।

অজিত ও কিরণের শুধু নামে নয়, বিধাতা তাহাদের অনেক রকমেই মিল করিয়া দিয়াছেন। অজিতের বৌএর কোলে একটি মেয়ে, আর কিরণের বৌএর কোলে একটি ছেলে। ছেলেটিই বড়। এবং বড় হইলে যাহা হয় সে কথাও তাহাদের হইয়া গেছে। এই ছেলে আর মেয়ে বড় হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে ত' তাহাদের বিবাহ দিবে।

আর-একটা মিলের কথা এখনও বলি নাই। প্রথম যেদিন সেকথা তাহাদের জানাজানি হয়, সেদিন ত' দু'জনে তাহারা হাসিয়াই খুন!

অজিতের বৌএর নাম অরুণা আর কিরণের বৌএর নাম—করুণা। দু'জনেই যুবতী, দু'জনেই সুন্দরী!

তবে চুলচেরা সূক্ষ্ম বিচার যদি করিতে হয় ত' অজিতের স্ত্রী অরুণার কাছে শুধু করুণা কেন, অনেক মেয়েই সহজে দাঁড়াইতে পারে না। মেয়েটার এত রূপ!

রূপের কথা উঠিলে অরুণা তাই হাসিয়া বলে:

"উনি কি বলেন জানো ভাই? বলেন, তোমায় একা রেখে যেতে আমার ভয় করে।"

বলিয়াই সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

করুণা বলে: "তা ভাই সত্যি তোর রূপ দেখলে হিংসে হয়।"

অরুণা বলে: "যাঃ, তুই নিজেই বা কিসে কম শুনি?"

করুণা বলে: "হ্যাঁ—আমার আবার রূপ!"

তাহাদের দুই ছেলেমেয়ের বিবাহের সূত্র ধরিয়া অজিত ও কিরণ ইহারই মধ্যে তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধটা পাতাইয়া লইয়াছে। নিজেরা অবশ্য দু'জন দু'জনের নাম ধরিয়াই ডাকে, কিন্তু অরুণা ও করুণাকে ডাকিবার সময় অজিত ডাকে, বেয়ান্, কিরণও ডাকে বেয়ান্।

আপিসের ছুটির পর কিরণ এক-একদিন অজিতের সঙ্গে সঙ্গে সরাসর তাহারই ব্যারেকে গিয়া ওঠে। বেয়ানের সঙ্গে হাসি তামাসা গল্প আমোদ আহ্লাদ করিয়া অনেক রাত্রে হয়ত নিজের ব্যারেকে ফিরিয়া আসিয়া বলে, "ওগো' আজ আর আমি খাব না।"

করুণা জিজ্ঞাসা করে, "কেন?"

কিরণ বলে, "কেন আবার! বেয়ান্ দিলে আচ্ছা করে' খাইয়ে।"

"তুমি খেলে কেন?"

কিরণ হাসিতে হাসিতে বলে, "খেলে কেন! বেয়ানের কথা ঠেলবার কি জো আছে! হেসে হেসে কথা যখন বলে, তখন ত' অনুরোধ মনে হয় না, মনে হয়—আদেশ। সাংঘাতিক মেয়ে!"

করুণা বলে, "তা না হয় হ'লো। কিন্তু এই ত' পাশেই রয়েছি, হেঁকে একবার বললে না কেন? খাবারগুলো তাহ'লে নষ্ট হ'তো না।"

কিরণ আবার হাসিতে লাগিল। বলিল, "বলতে আর দিলে কোথায়! বেয়ান্ বললে, নষ্ট হোক্ না একদিন।"

করুণা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা বলবে বই-কি! দাঁড়াও উই খাবার আমি কাল সকালে অরুণাকেই খাওয়াব।"

কিরণ বলিল, "তা তোমরা যা খুশী তাই কোরো, এখন আমাকে রেহাই দাও। আমি খেয়ে এসেছি, এইবার ঘুমোই।"

করুণা হেলিয়া দুলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ওই খানেই ঘুমোলে না কেন?"

কথাটা তেমন সুবিধার বলিয়া মনে হইল না। কিরণ তাহার মুখের পানে তাকাইল। দেখিল সে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। বলিল:

"হাসছো যে অমন করে'?"

করুণা বলিল, "হাসছি আমার খুশী। হাসতেও পাব না?"

কিরণশঙ্কর বলিল, "না, এ-হাসির যেন কিছু মানে আছে বলে' মনে হচ্ছে।"

করুণাময়ী বলিল, "বুঝতে তা হ'লে পেরেছ? কি বল? এঁ্যা?"

"কি বুঝতে পেরেছি?"

করুণা বলিল, "এই হাসির মানে।"

"না না, সত্যি বলছি, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।"

"তাহ'লে আর বুঝেও কাজ নেই।" বলিয়া মুখ টিপিয়া আর-একবার হাসিয়া করুণা চলিয়া যাইতেছিল, হাত বাড়াইয়া টপ্ করিয়া তাহার কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া ধরিয়া কিরণ বলিল, "বলে' যাও বলছি, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।"

বাধা হইয়া করুণাকে তাহার কাছে আসিয়া বসিতে হইল। বলিল, "বলছিলাম—তোমার ওই সুন্দরী বেয়ানের কাছেই আজ থাকলে না কেন? সাংঘাতিক মেয়ে! [illegible] মেয়ে!—চমৎকার হাসে! চমৎকার কথা বলে,—[illegible] বলে না, যেন আদেশ করে!"

"থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। ও, এই!" বলিয়া কিরণ হাসিতে লাগিল।

করুণা বলিল, "না, থাক্ থাক্ কেন? আমরা কুচ্ছিৎ, আমরা কদাকার, তাই বুঝি আপিস-ফেরতা বাবুর আর দেখা মেলে না,—সরাসর ওইখানেই যাওয়া হয়।"

কিরণ বলিল, "ছি করুণা, তোমার ভারি ছোট মন!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এমন সবারই হয়!" বলিয়া করুণা এইবার বোধ করি রাগ করিয়াই উঠিয়া গেল।

শহরে সে বৎসর অসম্ভব রকম কলেরা আরম্ভ হইল। সে রকম ব্যাধি—ডাক্তারেরা বলিতে লাগিলেন, কলিকাতা শহরে তাঁহারা বহুকাল দেখেন নাই। হাঁসপাতালগুলা ভর্ত্তি হইয়া গেল। দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। কত লোক যে কলিকাতা ছাড়িয়া পালাইয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে বাহির হইলেই দেখা যায়, একটার পর একটা শবযাত্রীর দল ক্রমাগত শ্মশানের দিকে চলিয়াছে। কর্ম্ম-কোলাহলময় মহানগরী কলিকাতায় দিনের বেলা সহজে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সন্ধ্যা হইবামাত্র চারিদিক হইতে কান্নার রোল উঠিতে থাকে; রাত্রি যতই গভীর হইয়া আসে, বহু দূরের রাস্তা হইতেও শববাহকদের হরিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া ওঠে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা ভ্রান্ত ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া যায়।

অজিতেরও কোথাও পালাইবার স্থান নাই, কিরণেরও নাই। আর থাকিলেই বা কি হইবে! মার্চ্চেণ্ট আপিসের কাজ—মরিলেও ছুটি পাইবে না।

অজিতের ভয় যেন একটুখানি বেশি। সেদিন সে আপিস যাইবার পথে জোর করিয়া হাসিয়া কিরণকে বলিল, "আচ্ছা ভাই, যদি মরে' যাই ত' কি হবে আমাদের?"

সে ভয় যে কিরণেরও হয় নাই তাহা নয়, তবু সে বন্ধুকে খানিকটা সাহস দিবার জন্য বলিল, "এত অবিচার ভগবান এ দুঃখ করে না অজিত।"

অজিত বোধকরি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। একটু পরে, "না ভাই, মৃত্যুর কথা কিছু বলবার জো নেই। ফট্ করে' কোন্‌দিন হয়ত মরে যেতে পারি।"

কিরণ তখনও তাহাকে সাহস দিতেছিল। বলিল, "না রে, আপিসের কেরাণীরা সহজে মরে না।"

"হাসির কথা নয় কিরণ···"

কিরণ বলিল, "তোর আর ভাবনা কি অজিত, পাঁচ হাজার টাকা ইন্‌সিওর্ করেছিস্; মাগ-ছেলে তবু খেতে পাবে, আর আমি যদি মরি,···বৌটাকে আর ছেলেটাকে দেখিস্ যেন মাইরি! কোথাও গিয়ে যে মাথা গুঁজে পড়ে' থাকবে তারও উপায় নেই।"

অজিত বলিল, "আর আমার? আমারও ত' তাই।"

কিরণ বলিল, "ভগবান আমাদের আচ্ছা মিলিয়েছে যা হোক্! ব্যাটার বাহাদুরী আছে।"

অজিত তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। কিরণও হাসিল।

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে মানবের অন্তরাত্মা তাহা বুঝিতে পারে কিনা তাই-বা কে জানে!

ঠিক তাহার পরের দিনই মহামারী ওলাওঠা আসিয়া অজিতকে আক্রমণ করিল এবং মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বলিয়া কিরণকে কাছে ডাকিয়া ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরিয়া ভয়ানক একটা হৈ-চৈ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

বন্ধু কিরণ তাহার অনেক করিল, ডাক্তারের চেষ্টারও ত্রুটি হইল না, কিন্তু সব-কিছুকে উপেক্ষা করিয়া কিরণের ও করুণার হাতে ধরিয়া অরুণা ও তাহার শিশু কন্যাটিকে দেখিতে বলিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পার হইতে না হইতেই অজিত মরিয়া গেল।

মাঝ-নদীতে ভরাডুবির দৃশ্য দেখিয়াছি। যে-নৌকা সকলকে লইয়াই ডুবে তাহার জন্য দুঃখ নাই। কিন্তু এ-দৃশ্য যেমন ভয়াবহ, তেমনি করুণ! জ্ঞানীগুণীরা বলেন, পরম কারুণিক বিশ্ববিধাতার নাকি ইহাই নিয়ম এবং ইহাকে নাকি শান্ত হৃদয়ে নত মস্তকে স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু স্বীকার করা দূরে থাক্, নিসাড় নিস্পন্দ অজিতের মৃতদেহ অরুণা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না! মাথা ঠুকিয়া সে রক্ত বাহির করিয়াছে, আলুলায়িতকুন্তলা শোকাভিহতা অরুণা দুই চক্ষে তাহার চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে, মনে হইতেছে যেন সে তাহার স্বামীর সঙ্গে মরিতে পারিলেই বাঁচে!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। অন্য দশ-জনের মৃতদেহ ঠিক যেমন করিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া শ্মশানে লইয়া যায়, অজিতের মৃতদেহও ঠিক তেমনি করিয়া অরুণার বাহুবন্ধন হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইল।

অকস্মাৎ একটি দিনের মধ্যেই সব কিছু শেষ হইয়া গেল।

বন্ধুর হাতে স্ত্রী ও কন্যাকে সমর্পণ করিয়া অজিতশঙ্কর চলিয়া গেল।

তা যাক্। বন্ধু কিরণশঙ্কর তাহার প্রাণের বন্ধু। তাহার পরের দিনই ওদিকের ব্যারেকের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অরুণাকে তাহার শিশুকন্যা ও তাহার সংসারটিকে কিরণ তাহার নিজের ব্যারেকে তুলিয়া আনিল।

পাশাপাশি দু'তিনখানি ঘর। দুইটি পরিবারের পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

স্বামীশোকে অরুণা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথাই।

কিন্তু এ পৃথিবীতে সকলেরই একটা সীমা আছে। এ-বাড়ীতে আসিয়া কান্নার বেগ তাহার কতকটা প্রশমিত হইতেই চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া সে কিরণের মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হবে ভাই?"

মেয়েটা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে! বলিতে বলিতেই দুই চোখ তাহার আবার জলে ভরিয়া আসিল, ঠোঁট দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিরণ বলিল, "কিচ্ছু ভয় নেই বেয়ান, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তুমি একটুখানি ধৈর্য্য ধরে' থাকো, আর কি করবে বল, এতে মানুষের হাত কিছু নেই।"

মানুষের হাত যে ইহাতে নাই, ইহা যে তাহার পোড়া অদৃষ্টের দোষ, সে কথা অরুণা যেন আজকাল বুঝিয়াছে। কপালে সে সিঁদুরের দাগ আর নাই, এয়োতির চিহ্ন ঘুচিয়াছে, পরণে শাদা ধুতি,—বহ্নিবর্ণা সুন্দরী অরুণা যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছে!

অজিতশঙ্করের পাঁচ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সের পলিশি লইয়া কিরণশঙ্কর বীমা-আপিসে কয়েকদিন ধরিয়াই ঘোরাঘুরি করিতেছিল। সেদিন সে আপিস-ফেরত বাড়ী আসিয়াই অরুণার কাছে গিয়া বলিল, "এতদিন পরে সব ঠিকঠাক্ হয়ে গেল। টাকাটা কাল পাওয়া যাবে।"

অরুণা মুখ তুলিয়া বলিল, "বেশ।"

কিরণ বলিল, "কাল ওদের আপিস থেকে লোক আসবে টাকা নিয়ে।"

অরুণা হেঁটমুখে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, বলিল, "সকালে আসতে বলে' এসেছ ত'? নইলে দুপুরে যদি আসে তাহ'লে ত' হবে না বেরি, তুমি বাড়ী থাকবে না, আমরা মেয়ে মানুষ,··"

কিরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে বে'ন্।"

অরুণাও ম্লান একটুখানি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। সেই রাঙা রাঙা দুটি ঠোঁট! সেই হাসি! হাসিলে এখনও তেমনি গালে তাহার টোল পড়ে! যে যাইবার সেই শুধু চলিয়া গিয়াছে, যাহা থাকিবার তাহা এখনও তেমনিই আছে!

হাতের সোনার চুড়িকয়গাছি সে খুলিয়া দিল। কিরণের দৃষ্টি সেইদিকেই পড়িল। এই চুড়ি কয়গাছি সে বিধবা হইবার দিনেই শাঁখা খুলিয়া সিঁদুর মুছিবার সঙ্গে সঙ্গেই খুলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, এই কিরণই সেদিন তাহাকে খুলিতে দেয় নাই। কিন্তু আজ তাহাকে কিছু না জানাইয়াই সেগুলি সে খুলিয়া ফেলিয়াছে।

কিরণ বলিল, "এ কি! হাতের চুড়ি কি হ'লো?"

অরুণা মাথা হেঁট করিয়া বলিল:

"খুলে রেখিছি।"

"কেন? সেদিন এত করে' বললাম···"

অরুণা বলিল, "তা হোক্।"

কিরণ বলিল, "বা-রে! তা হোক্ কি রকম! ওই ন্যাড়া ন্যাড়া হাত নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াবে? আর তাই আমাদের দেখতে হবে?"

বলিয়াই সে প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।—"না না না না, তা হবে না, তা হবে না। চুড়ি তোমায় আবার পরতে হবে।"

কথাগুলা অরুণার বোধহয় ভাল লাগিল না। "আচ্ছা সে হবে এখন।" বলিয়া কি-একটা কাজের জন্য বোধকরি বঁটিটা সরাইয়া রাখিয়া অন্যত্রে চলিয়া গেল।

ওদিকে এই কথারই সূত্র ধরিয়া করুণা লাগাইল ঝগড়া! বেশি জোরে চীৎকার করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই,

অরুণা হয়ত' শুনিতে পাইবে। তাই সে স্বামীকে তাহার নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল,—"বলি, তোমার এত মাথা ব্যথা কেন শুনি! বিধবা মেয়ে,—চুড়ি পরবে কি গা! আমি বলেছি খুলে রাখতে।"

তাহার চুড়ি খুলিবার কারণটা কিরণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। বলিল, "ও! তুমি বলেছ? কিন্তু ছি! নাই বা বলতে ও-কথা! ওই কম বয়েসে বিধবা হ'লো, তার ওপর···"

কথাটা করুণা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। তাহার মুখের সুমুখে হাতদুইটা নাড়িয়া বলিল, "তা বিধবা হয়েছে··· তুমি ওর দুঃখু ঘোচাও গে যাও!"

কিরণ বলিল, "ছি! ও কি কথা!"

করুণা বলিল, "আমিত' কানা নই যে, দেখতে পাব না! বোকাও নই যে, চোখে ধুলো দেবে। সব জানি, সব বুঝি।"

কথার ইঙ্গিতটা যে কোনদিক দিয়া বহিতেছে কিরণের বুঝিতে বাকি রহিল না। তিরস্কার করিতে গেলে হয়ত' হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে, এত জোরে চীৎকার করিয়া সে কলহ সুরু করিবে যে অরুণাও হয়ত তাহা শুনিতে পাইবে। তাই এক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাই ভালো ভাবিয়া কিরণ চুপ করিয়াই সেখান হইতে পলায়ন করিল।

অজিতশঙ্করের লাইফ্ ইন্‌সিওরের পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। কোম্পানীর আপিস হইতে লোক আসিয়া অরুণার নামে একখানি চেক্ দিয়া গিয়াছিল, সেই চেক্ কিরণ সেদিন ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিল। পাঁচ হাজার টাকার পাঁচ তাড়া নোট! নোটগুলি গুণিয়া গুণিয়া অরুণাকে বুঝাইয়া দিয়া কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—'দাও, এবার আমায় কি কমিশন দেবে দাও!'

অরুণা ঈষৎ হাসিয়া নোটের পাঁচটি তাড়াই তাহার দিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—'নাও। তুমি না থাকলে একি আর আমি একা মেয়েমানুষ, ওই এত হাঙ্গামা করে' বের করতে পারতাম কখনও!'

কিরণ হাসিতে লাগিল।

অরুণা বলিল, 'তোমার গলগ্রহ হয়ে আর আমি থাকব না ভাই।'

কিরণ বলিল, সে কি! কোথায় যাবে?'

"আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই আছে রেঙ্গুনে, সেইখানেই একখানি চিঠি লিখব ভাবছি। টাকাও ত' কিছু হাতে এলো।"

কিরণ বলিল, "না তা হয় না। অজিত আমার হাতে-হাতে তোমায় সমর্পণ করে দিয়ে গেছে, তোমার ওই মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবো, তোমাকে এইখানেই চিরকাল থাকতে হবে।"

অরুণা একটুখানি হাসিল। বলিল, "মেয়েকে আমি এই টাকা দিয়ে লেখাপড়া শেখাব ভাই। তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

কিরণ বলিল, "আচ্ছা, সে পরামর্শ আজ রাত্রে করব, এখন থাক্।"

পাশাপাশি দু'খানি ঘর। একটিতে অরুণা থাকে তাহার শিশু কন্যাটিকে লইয়া, আর একটিতে থাকে কিরণ, করুণা আর তাহাদের সেই ছোট ছেলেটি।

রাত্রে অরুণার সঙ্গে কিরণ পরামর্শ করিবে,—কথাটা করুণা শুনিয়াছে। কিন্তু পরামর্শ করিবার কি আর সময় নাই! রাত্রে কেন?

আহারাদি করিয়া ও-ঘরে অরুণা তাহার মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া শুইয়াছে। এঘরে করুণা ও কিরণ!

রাত্রি তখন কত হইয়াছে কে জানে! দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে নিশ্চয়ই। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম্! কিসের শব্দে হঠাৎ করুণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; ঘর অন্ধকার, কিন্তু তবু সেই আব্‌ছা অন্ধকারে দেখিতে পাওয়া গেল, স্বামী তাহার খাট হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া নামিতেছে। করুণার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। দেখিল, কিরণ ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

করুণা ভাবিল, আজ সে তাহাদের হাতে-হাতে ধরিয়া ফেলিবে। অত সুন্দরী ওই বিধবা মেয়েটাকে স্বামীর কথা শুনিয়া বাড়ীতে স্থান দেওয়াই তাহার অন্যায় হইয়াছে। যাই হোক্ এই ব্যাপারের পর আর তাহাকে রাখা চলে না। কালই তাহাকে সে তাড়াইয়া দিবে।

ঘর হইতে কিরণ বাহির হইয়া আবার তেমনি দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিল। করুণা ওদিকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

করুণাও পা টিপিয়া টিপিয়া খাট হইতে নামিল। দরজার কাছে উঁকি মারিয়া দেখিল—অন্ধকারে কিরণের অবয়ব ওদিকের বারান্দা ঘুরিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এদিকের দরজাটা অরুণার বন্ধই থাকে, তাই বোধ হয় ওদিকের ওই ছোট দরজাটা দিয়া ঢুকিবার মতলব!

অন্ধকারে কান পাতিয়া করুণা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে অভিমানে তখন তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছে!

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তখনও পর্য্যন্ত ওঘরে কাহারও গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না। করুণা ভাবিল, এখনও এইখানে তাহার এরকম ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়। আগাইয়া যাওয়াই ভালো।

যাইবে কি যাইবে না ভাবিতেছে, এমন সময় করুণা দেখিল, পা টিপিয়া টিপিয়া কিরণ আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

করুণা একটুখানি সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর চুপ করিয়া রহিল। কিরণ ঘরে ঢুকিতেই টপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া করুণা বলিল, "কোথায় গিয়েছিলে? ছি ছি ছি ছি! এরই জন্যে এতদিন ওকে—"

কিরণ তাহার মুখখানা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় বলিল,—"চুপ্!"

বলিয়াই সে দরজায় খিল বন্ধ করিয়া দিয়া হাত বাড়াইয়া আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল।

করুণা বলিল, 'হ্যাঁ—আমি চুপ করে' থাকি আর তুমি ওকে নিয়ে এমনি কেলেঙ্কারী কর!'

কিরণ বলিল, "ওগো তোমার দুটি হাতে ধরে' আমি অনুরোধ করছি, তুমি চুপ কর। অনেক কথা আছে, এরপর বলব।"

করুণা বলিল, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কাল আমি ওকে এখান থেকে খ্যাংরা মেরে তাড়িয়ে দেবো। টাকা পেয়েছে এইবার চলে যাক্।"

কিরণ বলিল, "আচ্ছা তাই দিয়ো, কিন্তু দ্যাখো, আমি যে রাত্রে উঠে গিয়েছিলাম এ-কথা, যদি বল ত'—হয় নিজে মরব আর না হয় ত' তোমায় খুন করে' ফেলব।"

এ-কথার উপর আর কথা চলে না। এত রাগ দুঃখ অভিমান—সব-কিছু মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া করুণা ভিতরে ভিতরে গর্জ্জাইতে লাগিল।

বলিল, "বেশ, তা না হয় বললাম না, কিন্তু কাল আমি ওকে যেমন করে' হোক্—তাড়াব—তাড়াব—তাড়াব। এমন করে' আমার সর্ব্বনাশ ওকে আমি করতে দেবো না।"

কিরণ বলিল, "এখন ঘুমোও, তারপর সে কাল দেখা যাবে।"

কিন্তু তাহার পরদিন সকালে যাহা ঘটিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অদ্ভুত!

অরুণা একেবারে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল করুণার কাছে।—বলিল, "সে কোথায়? তোমার বর কোথায় ভাই?"

করুণা তাহার হাব-ভাব দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল, "কেন? কি হয়েছে কি? এরকম করছ যে?"

অরুণা মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না।

ব্যাপার দেখিয়া স্নানের ঘর হইতে কিরণ ছুটিয়া আসিল।—"কি হ'লো তোমার, কি হয়েছে কি?"

অরুণা তাহার কাপড়ের তলা হইতে নোটের একটি বাণ্ডিল বাহির করিয়া সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'পাঁচ হাজারের পাঁচটি বাণ্ডিল কাল আমি বিছানার তলায় রেখেছিলাম, তার মধ্যে চার হাজারের চারটে বাণ্ডিল নেই।'

কিরণ একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, 'নেই! সে কি! কোথায় রেখেছিলে?'

অরুণার দুচোখ ভরিয়া তখন জল আসিয়াছে। বলিল, 'রেখেছিলাম—বিছানার তলায়। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে'...

কিরণ বলিল, 'ছি ছি, বিছানার তলায় রাখে কখনও!'

এই বলিয়া সে চাকরটাকে ডাকিয়া ঝিকে ডাকিয়া হাঁকাহাঁকি চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

এতক্ষণ পরে করুণা তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটুখানি হাসিবার জন্য আড়ালে চলিয়া গেল আর এদিকে সহায়সম্বলহীনা অনাথিনী অরুণা তখন তাহার সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। কিন্তু কে যে তাহাকে এমন করিয়া পথে বসাইল শেষ পর্য্যন্ত তাহার কোনও নিরাকরণ হইল না।

পূর্ণিমা

—গল্প—

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

কলিকাতার এক পুরানো পাড়া। সরু গলি যেখানে প্রশস্ততর পথে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই মোড়ে একটি ছোট মনোহারী দোকান—খুকীর চুষিকাঠি, পুতুল; খোকনের ইঞ্জিনগাড়ী, লজনচুষ; খোকার মায়ের পায়ের তরল আলতা, চুলের কাঁটা ফিতে, সুগন্ধি সাবান পাউডার; খোকার বাবার সার্টের বোতাম, লেখবার কালী, সিগারেট; স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পেন্সিল, একসারসাইজ্ বুক, মার্ব্বেল, ঘুড়ির সুতো, ইত্যাদি সময় অসময়ের দরকারী অ-দরকারী নানা টুকটাক জিনিষ আজ কুড়ি বছর ধরিয়া এই দোকানটি পাড়ার পরিবারদের সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে। আজকাল পাড়ার কলেজের ছেলেরা সাহেব পাড়ায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়া জিনিষ কেনে, খোকাদেরও পুরানো ধরণের ইঞ্জিনগাড়ী পছন্দ হয় না, হালফ্যাসানের এরোপ্লেন চাই; কিন্তু পুরাতন বাড়ীগুলির মহিলা-সম্প্রদায় এই দোকানটির ভক্ত; কারণ দরকার হইলেই খালি বিস্কুটের টিন, খালি সাবানের বাক্স শশিবাবুর দোকান হইতে চাহিলেই পাওয়া যায়। শশিবাবু দোকানটি মডার্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিউ মার্কেটের দোকানগুলির মত নানা লোভনীয় সুন্দর দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার মত অর্থ তাঁহার ছিল না।

ভাদ্রের সুন্দর প্রভাত; ক্ষান্তবর্ষণ রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে শুভ্র লঘুমেঘগুলি কিশোর মনের দিবাস্বপ্নের মত। শরৎ-প্রভাতের শুভ্র আলো গলির পথটি দীপ্ত মায়াময় করিয়া তুলিয়াছে; হলদে বাড়ীর বালি-ওঠা দেওয়ালে, পথের কালো পিচে, সংসার-সংগ্রাম-পীড়িত নর-নারীর মুখে কোন যাদুমন্ত্র বুলাইয়া দিয়াছে। দোকানের ছোট দরজার ধারে ছোট এক লোহার চেয়ারে বসিয়া যে তরুণ যুবকটি দোকানের বেচাকেনা করিতেছিল, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল দোকান বন্ধ করিয়া এই অনির্ব্বচনীয় আলোকজ্জ্বল পথে বাহির হইয়া পড়ে। কাজে মন লাগিতেছিল না।

আট বছরের ছোট মেয়ে, পলাশ ফুলের রংএর খদ্দরের ফ্রক পরা; দীঘির পাড়ে ব্যাকুল বেণুর মত চঞ্চল সে; তার চোখ-ভরা দুষ্টামি, মুখ-ভরা কৌতুক; কচিআমপাতার মত শ্যামশ্রী; স্কিপ করে, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে যায়, ছাদে ঘুড়ি ওড়ান দেখে, তেতুল-লঙ্কা দিয়ে নিষিদ্ধ খাবার খায়, স্কুলের গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখে, নাকে মুখে ভাত গুঁজে বেণী দুলিয়ে ছোটে, বকুনি খায়, কলহাস্যে কথা বলে, গিরিঝর্ণার মত উদ্দাম উৎসুক উন্মনা।

কিন্তু এক সময় সে শান্ত হয়, গিরিঝর্ণা যেন সমতল ক্ষেত্রের বিপুলা নদীর মধ্যে কলধ্বনি হারাইয়া স্তব্ধ। তাহার দিদির সম্মুখে সে মৃদু হাসে, হাত পা ছোঁড়ে না, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না; চেঁচিয়ে কথা বলে না, রৌদ্রদীপ্ত নির্ব্বাত মধ্যাহ্নে নিস্তরঙ্গ নদীজলে বেণুবন যেমন নিষ্কম্পিতভাবে আপনার ছায়া দেখে, তেম্নি চুপ করিয়া সে থাকে দিদির কাছে; তার চোখের চঞ্চল চাউনি স্থির করুণ হইয়া আসে।

এই ছোট মেয়েটিকে পরমেশপ্রসন্নের বড় ভালো লাগে—তাহার চঞ্চল প্রাণময় গতির সরল ভঙ্গী। মেয়েটির নাম যে রাণু, সব সময়ে তাহার মনে থাকে না, সে ভুল নামে ডাকে, বেণু বা মীনু। রাণু ঠোঁট ফুলাইয়া বলে, "যান্, আমার নাম আপনার মনে থাকে না, আমি আপনার দোকানে আর কখনো আসব না।" তারপর ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে, রঙীন সুতো বা ছোট ছুরির ইন্ধান করে, দিদির নিকট হইতে যে তিন আনা পয়সা আদায় করিয়াছে, তাহা খরচ করিয়া না ফেলিতে পারিলে তাহার মনে শান্তি নেই।

রঙীন পেন্সিল, সাবানের সুন্দর খালি বাক্স, সিগারেটের

বাক্সের ছবি ইত্যাদি দিয়া পরমেশ তাহার সহিত ভাব করে। তাহাকে একটু ভয়ও করে। তাহার দোকানে অনেক জিনিষই থাকে না বা রাণুর পছন্দ হয় না; রাণু ভয় দেখায়, সে বড় রাস্তার বড় দোকানে গিয়া সব জিনিষ কিনিবে।

শরতের সেই সুন্দর সকাল বেলাতে রাণুকে দোকানের দিকে আসিতে দেখিয়া পরমেশ কিন্তু একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; বার্টেণ্ড রাসেলের সদ্যপ্রকাশিত একখানি বইএর ওপর গভীর মনোযোগ দিল।

'দিদি জিজ্ঞেস করলেন, বার্লিন উল এসেছে?'

কোন উত্তর নাই।

'সারাক্ষণ যদি বই পড়েন, তাহলে দোকান উঠিয়ে দিয়ে চলে যান।'

'ও টেবি, থুড়ি থুড়ি, রাণু, কি চাই সকাল বেলায়?'

'বা, বার্লিন উল যে কাল অর্ডার দিয়ে গেলুম।'

'ওরে যদু দেখত উলটা।'

যদু নামক ভৃত্যটি দোকানের সত্যিকার বিক্রেতা, কোথায় কোন জিনিষ আছে, কত দর সব তাহার জানা; এই পুরাতন ভৃত্যটি না থাকিলে পরমেশকে দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইত।

যদু একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "উল কোথায় আনলেন দাদাবাবু? কাল ত সারাদিন ওই বই নিয়েই বসে রইলেন, বল্লুম এত করে একবার বাজারে যান, কত যে জিনিষ কেনবার বাকী রয়েছে—আলতা সব ফুরিয়ে গেছে—দোকানের আর মান ইজ্জত রইল না—'

"ওই দেখ, ভুলে গেছিত রাণু,—কাল—তোমার দিদিকে বোলো, কাল নিশ্চয়ই পাবেন, কিন্তু রং চাই?"

"বা, আমি বলে গেলুম, ভুলে গেছেন, চাপা ফুলের রং, আমি নমুনা দিয়ে গেছি, মিলিয়ে নেব।"

"ওরে যদু শুনে রাখলি, দুপুরে আমাকে মনে করিয়ে দিস।"

"আমাকে টাকা দেবেন দাদাবাবু, আমিই গিয়ে নিয়ে আসব, আপনাকে দিয়ে আর হবে না—কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে আমি কতদিন গেছি—"

'আচ্ছা, ভেরি স্যরি মিস রাণু, আজ স্কুল নেই বুঝি? কবে পূজোর ছুটি?'

"ও, পূজোর ছুটি, সেত অনেক দেরী। কিন্তু কাল যদি উল না পাই আমি রামবাবুর দোকানে যাব বলছি,—দিদি বলছিলেন, আপনার দোকান চলবে না—শীগগির উঠে যাবে—আজকালকার দিনে খদ্দেরের মন জুগিয়ে না চল্লে—"

"বলছিলেন না কি! উঠে গেলে ত বাঁচা যায়—ওরে সেই নতুন পেন্সিল দেখাত—কেমন সুন্দর"

"কত দাম?"

"ওর আর দাম কি।"

"না, দিদি বারণ করেছেন বিনা পয়সায় জিনিষ নিতে—"

"পয়সায় দু'টো"

যদু একটু ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল; চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া পরমেশ দু'পয়সা দামের পেন্সিল এক পয়সায় দু'টা দিয়া শরতপ্রভাতের বেচাকেনা অতি সুলভে আরম্ভ করিল। তাহার ইচ্ছা হইল দোকানের সব জিনিষ "পূজার সেল" বলিয়া খুব সস্তায় বেচিয়া টাকাগুলি লইয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়ে।

রঙীন পেন্সিল লইয়া রাণু লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। পরমেশ আন্‌মনা হইয়া বসিয়া রহিল। কয়েকমাস হইল খুকিরা পাড়াতে আসিয়াছে, তাহার দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার; বিশেষতঃ খুকীর অপরিচিতা দিদিই তার বড় পেট্রনেস্। কোন বাড়ীটি তাহাদের, বাড়ীতে কে কে আছেন, এ সব খবর জানিবার ইচ্ছা হইলেও. কুড়েমিতে তাহার জিজ্ঞাসা করা হইয়া উঠে নাই; আর রাণুর দিদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছে। তিনি তরুণী না যুবতী, বিবাহিতা না অবিবাহিতা, সে কিছুই জানিতে চায় না, আপনার মনে সে তাঁর ছবি আঁকিয়াছে, ছবির রেখাগুলি অস্পষ্ট কিন্তু বর্ণবৈচিত্র্যের অভাব নেই,—সুন্দরী কিশোরী, স্নিগ্ধ মুখ, গভীর উজ্জ্বল চোখ, কল্যাণকর্ম্মরত সুন্দর হাত, মুখে হাসি লাগিয়া আছে, সে হাসি মধুর উদাসতা মাখান,—ভাবিতে ভাবিতে শরতের আকাশ বাতাসের দিকে চাহিয়া তাহার অন্তর উন্মনা হইয়া গেল। দোকানে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উল ও অন্যান্য জিনিষ কিনিয়া

আনিতে হইবে, এই অজুহাতে দোকানের ভার যদুর ওপর দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বেতিহাস এইরূপ :

বেশীদিন নয়, ছয়মাস পূর্ব্বে, পরমেশপ্রসন্ন ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের খ্যাতনামা ছাত্র। সকালে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত করিত, দুপুরে ক্লাসে নোট লিখিত ও লাইব্রেরীতে পাঠ্যপুস্তক পড়িত, সন্ধ্যায় অধ্যাপকদের বাড়ী গিয়া দার্শনিক তর্ক তুলিত, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত স্পেংলার এডিংটন ব্লক্ ইত্যাদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বই পড়িত। সংসারানভিজ্ঞ পঠনশীল যুবকটিকে তাহার পিতা একদিনের জন্যও দোকানের তত্ত্বাবধান করিতে বলেন নাই।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হইতে ফিরিয়া শুনিল, পিতার কলেরা হইয়াছে। কলেরা রোগের গুরুত্বের জ্ঞান তাহার ছিলনা, হোইটহেডের এক নতুন বই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সে তার প্রিয় প্রফেসারের বাড়ী চলিয়া গেল। পরদিন যখন সে দর্শন-ক্লাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত, ডাক্তার তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, তাহার পিতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সে হতভম্ব হইয়া গেল, শুধু এইটুকু বুঝিল, আজ দুপুরে লাইব্রেরীতে নব্য ন্যায় বা নিউ লজিক সম্বন্ধে বই পড়া হইবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় তাহার পিতার মৃত্যু হইল। সম্বলের মধ্যে গলির মোড়ে মনোহারী দোকানটি। জীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীটিও পৈত্রিক ছিল, দোকানের আয় হইতে সংসার কোনরূপে চলিয়া যাইত।

কলেজের বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, পড়াশোনা না ছাড়িয়া অন্ততঃ এম, এ, পাশ করিতে, তারপর দোকান দেখাশোনা করিলে চলিবে। দু'একজন বড়লোক বন্ধু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেও রাজী হইলেন।

পাড়ার প্রবীণ প্রতিবেশীগণ বলিলেন, বাপু, দোকানটি তোমাদের লক্ষ্মী, ওটি ভাল করে দেখ, ছেলেমানুষ আছ, উন্নতি কর, এখন কত এম, এ পাশ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সরল শিশুস্বভাবের হইলেও পরমেশের আত্মসম্মানবোধ অতি তীক্ষ্ণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা উগ্র ছিল। তাহার পিতা দোকানটির সহিত তাহার অর্দ্ধ-উন্মাদিনী মাতা ও এক বিধবা শুচিবাইগ্রস্থা ভগ্নির ভার তার ওপর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার বোন যখন সতেরো বৎসরে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, মাতার উন্মাদের লক্ষণ প্রথম দেখা দিল; তার তিনবৎসর পরে সেই হতভাগিনী যখন তার একমাত্র পুত্রকে তিন দিনের জরে হারাইল, মাতা শোকে একেবারে পাগল হইয়া গেলেন। এখন তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থা, কিন্তু মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, ঘরের সকল দরজা জানলা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

মাতা ও ভগ্নির ভার লইয়া পরমেশ দোকান চালাইতে আরম্ভ করিল কিন্তু বিজ্ঞান দর্শনের গুরুভার বইগুলি জঞ্জালের মত সরাইয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম্ থিওরির নব অর্থ, জিন্সের তারালোকের অপূর্ব্ব রহস্যকথা, ডিউই হোইটহেডের সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকে নব সমাজতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে,

'এক পয়সার সুচ দেবেন'—'দু'পয়সার খাতা আছে'—'মা একটা খালি কাগজের বাক্স চাইছেন'—'কাপড় কাচা সাবান নেই, ফুরিয়ে গেছে?'—'মশাই, গেঞ্জি, মোজা রাখেন না কেন, আজকাল সব দোকানে রাখে'—'মার্ব্বেল পয়সায় ক'টা, 'আমার জিনিষটা এনেছেন'—

ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে বা জিনিষ দিয়া হিসাব করিয়া দাম লইতে বিরক্তিতে পরমেশের মন তিক্ত হইয়া উঠিত। যদুর হাতে দোকানের ভার দিয়া সে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া চলিয়া যাইত।

সন্ধ্যায় উল পাইয়া রাণু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অর্ডার দিয়া একদিনের তাগাদায় সাধারণতঃ পরমেশের দোকান হইতে কোন জিনিষ পাওয়া যায় না, অন্ততঃ দু'দিন লাগে। দরকারী জিনিষ দেরিতে আসে বলিয়া দিদির সহিত সে ঝগড়া করিয়াছে, রাগের মাথায় বলিয়াছে, বড় রাস্তায় বড় দোকানে সব জিনিষ পাওয়া যায়, সেখান হইতে আনিলে এত দেরি হয় না। দিদি কিন্তু এ দোকান ভিন্ন অন্যকোন দোকান হইতে জিনিস কিনিতে নারাজ।

উলের সহিত গোলাপী ফিতে পাইয়া রাণু খুসি হইয়া

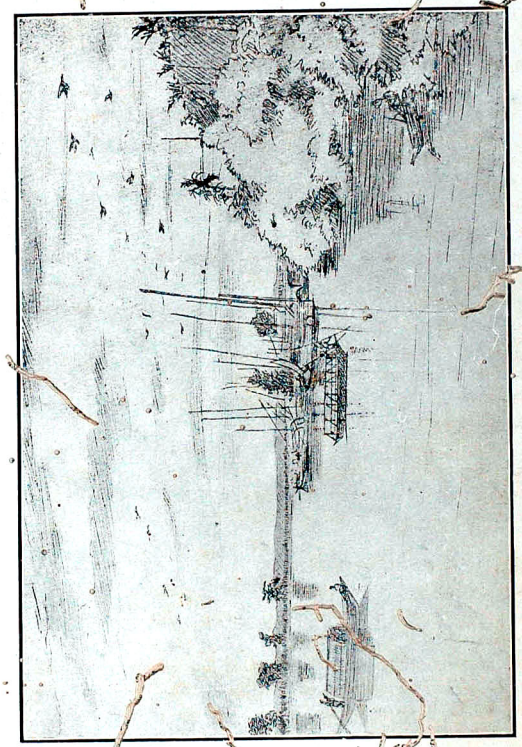

গোলাপী

বলিয়া উঠিল, "দিদি একদিন আপনার দোকানে জিনিষ কিনতে আসবেন, বলেছেন।'

'সত্যি নাকি!'

'সব জিনিষ ভাল করে এনে সাজিয়ে রাখুন, আপনার দোকানেত কিছু থাকে না, এমন বকুনি খাবেন—দেখবেনখ'ন —দিদি যখন আসবেন—,

হাসিতে হাসিতে রাণু চলিয়া গেল।

দিদি আসবেন—আপনার দোকানে দিদি আসবেন—কথাগুলি গানের সুরের মত শরৎ অপরাহ্নের আলোকে সমস্ত দোকানঘর জুড়িয়া সমস্ত অন্তর ভরিয়া বাজিতে লাগিল—দিদি আসবেন!

অনেক জিনিষের ফুরাইয়া গিয়াছে, ঘরটা সাজাইয়া রাখা দরকার। পরমেশ যদুকে ডাকিয়া অকারণে বকুনি দিল, দোকান এত অপরিষ্কার কেন। তারপর, কি কি জিনিষ কিনিয়া আনা দরকার তার ফর্দ্দ করিতে বসিল, কালই সব কিনিয়া আনা দরকার, রাণুর দিদি হঠাৎ কবে আসিয়া পড়েন, কে জানে।

ব্যাঙ্ক হইতে মোটা টাকা বাহির করিয়া সারাদিন মুরগীহাটা রাধাবাজার ঘুরিয়া পরমেশ নানাপ্রকার খেলনা, সাবান, লোভনীয় দ্রব্য কিনিয়া ফেলিল; এক চিত্রকর বন্ধুকে ডাকিয়া দোকান সাজাইল, বন্ধুটি এক সচিত্র প্লাকার্ডও দোকানের সামনে আঁকিয়া লিখিয়া দিলেন, "পূজার বাজার এখানে করুন।"

পাড়ার বড়ছেলেরা হাসিল, ছোট ছেলেরা ভিড় করিয়া দাড়াইল, বৃদ্ধেরা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর ছেলেদের জন্য খেলনা, লজনচুষ কিনিয়া বলিয়া গেলেন; "এই ত চাই বাবা, শশির অনেক পুণ্যের দোকান, মন দিয়ে দেখ।"

কিন্তু চারদিন কাটিয়া গেল, দিদি আসিলেন না। পরমেশের আর দোকান সাজাইবার কোন উৎসাহ রহিল না।

ভাদ্রের শেষে সহসা বর্ষা তাহার মেঘঘন কালো বেণী এলাইয়া দিল সমস্ত আকাশ জুড়িয়া; সারাদিন বর্ষণের পর অপরাহ্নে বৃষ্টি একটু থামিয়াছে, আকাশে থম্‌থমে ভাব। খরিদ্দার কেউ নাই, যদু এককোণে বসিয়া ঝিমাইতেছে, সেঁ্যতসেঁতে দোকানের মৃদু আলোকে পরমেশ একটি বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল, দোকান বন্ধ করিয়া তাহার পুরাতন অধ্যাপকের বাড়ী গিয়া কোন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমুল তর্ক জুড়িয়া দেয়, চায়ের কাপ আসে, সজল সন্ধ্যা তর্কে আলাপে জমিয়া উঠে। ভাবিতেছিল, জীবনের সত্যিকার সার্থকতা কোথায়?

একটি মোটরগাড়ী দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে—এই যে দোকান—রোখো—"

রাণুর কণ্ঠস্বর, হাঁ, রাণুর কণ্ঠস্বর! পরমেশ চমকিয়া চাহিয়া উঠিল।

রাণু তাড়াতাড়ি মোটর গাড়ী হইতে নামিল।

স্নিগ্ধ অজানা কণ্ঠস্বর, "জিজ্ঞেস করত, আমার বোনবায় কাঠি এসেছে কিনা—"

"নামবেনা দিদি—তুমি বলছিলে আজ দোকানে নামবে—বিষ্টি ত থেমেছে—"

"আচ্ছা একটু নামি!"

"দিদি এসেছেন!" রাণুর মুখ উৎসাহে আনন্দে জল্‌জল্।

পরমেশ অতি ব্যস্তভাবে দরজার গোড়ার চেয়ার সরাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। বিমুগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল, একটি কিশোরী রাণুর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন; চমৎকার বেশ, হাল্কা নীলরংএর জামা, তার ওপর সোনালী সিল্কের শাড়ী দেহের কাঞ্চনবর্ণের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে; অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি যেন ভাস্করের খোদাই-করা পাথরের মূর্ত্তি, অচঞ্চল স্থির দৃষ্টি।

চেয়ারটা এগাইয়া দিয়া থতমত ভাবে পরমেশ বলিল, —'আসুন—বসুন—'

রাণুর হাত ধরিয়া দরজার চৌকাঠ পার হইয়া রাণুর দিদি চেয়ারে স্থির হইয়া বসিলেন।

মোটরগাড়ী হইতে কে বলিল, "আমায় এখুনি যেতে হবে, দেরী কোরো না—"

দিদি উত্তর দিলেন, তুমি গাড়ী নিয়ে যাও দাদা, আমার একটু দেরী হবে, কয়েকটা জিনিষ দেখব—রাণুর সঙ্গে এটুকু হেঁটে চলে যেতে পারব।

"দোকানটা বড় অগোছাল রয়েছে—কি দেখাব বলুন—"

দিদি চেয়ারে আত্মসমাহিতভাবে বসে রইলেন, তাঁর সম্মুখে যেন কোন বস্তু নাই, বস্তুর মায়া নাই।

"আপনার বোনবার কাঁটা এনেছি—অনেক রকম উল এনেছি—কোন রং আপনার পছন্দ—"

দিদি স্থির হইয়া বসিয়া শুধু হাত বাড়াইলেন। পরমেশ আশ্চর্য্য হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল, জিজ্ঞাসুভাবে রাণুর দিকে চাহিল। রাণুর আর চপলতা নাই, সে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রাণু করুণভাবে ঘাড় নাড়িল, ধীরে পরমেশের নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দিদিত দেখ্‌তে পান না।

দিদি দেখ্‌তে পান না! দিদি অন্ধ! কাঁটাগুলি পরমেশের হাত হইতে পড়িয়া গেল, সে কাঁপিয়া উঠিল।

চারিদিক অন্ধকার করিয়া বাহিরে আবার বিষ্টি আসিল। বৃষ্টির ছাট আসাতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। আলো নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত ম্লান।

একটির পর একটি অনেক জিনিষ পরমেশ দিদির হাতে তুলিয়া দিল, কলের পুতুলের মত। মাঝে মাঝে দিদির শীতল কোমল আঙ্গুলের স্পর্শ তাহার উত্তপ্ত হস্তে লাভ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

হাত বুলাইয়া বাছিয়া জিনিষগুলি দিদি রাণুর হাতে তুলিয়া দিলেন।

শ্রান্ত হইয়া পরমেশ একটি টুলে বসিয়া পড়িল। মুখে কোন কথা আসিল না।

বাহিরে সঘনবর্ষণশব্দমুখরিত ভাদ্র সন্ধ্যার বজ্রসচকিত অন্ধকার। ভিতরে, উলের বাণ্ডিল্ সাবানের বাক্স আয়না খেলনা খাতার গাদা বিস্কুটের টিন আলতার শিশি নানা দ্রব্য ভরা দোকানের আলোছায়া—এক চপলা চঞ্চলা বালিকা, এক অন্ধ সুন্দরী কিশোরী, এক স্বপ্ন-বিহারী প্রেমতৃষিত যুবক বাক্যহারা বসিয়া—যুবকের অন্তরের পরমবেদনাকল্লোলের মত সজল বাতাস গলির মধ্যে হা হা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দোকানের বন্ধদ্বারের উপর আছাড় খাইয়া খাইয়া পড়িতে লাগিল।

অন্ধ! মর্ম্মরপ্রতিমাসম সুন্দরী তরুণী অন্ধ। তাহার চোখের সম্মুখে রং নাই, রূপ নাই, মন তিমিস্রা। সে যদি জন্মান্ধ হইত, তাহা হইলে অন্ধত্বের বেদনা বোধ করিতে পারিত না। কিন্তু একদিন সে তার ওই ছোট বোন রাণুর মত দুষ্টামিভরা দুই চক্ষু নাচাইয়া হাসিয়াছে, আকাশের নীলস্ফটিকের পেয়ালা হইতে শরতের আলোক সুধা পান করিয়াছে; সেই বর্ণের স্মৃতি তাহাকে কি উদাস করিয়া তোলে না!

বর্ষা সন্ধ্যায় অন্ধ কিশোরীর সহিত দেখা হইবার পর হইতে পরমেশ অন্তরের কোন অসহনীয় বেদনায় যেন পাগল হইয়া গেল। দুই চক্ষু বুজিয়া সে অনুভব করিতে চেষ্টা করিত অন্ধত্ব কেমন।

সে দোকান ভুলিল। আহার নিদ্রা ভুলিল। যদুরই সবচেয়ে মুস্কিল হইল। সে দেখিল, আগে দাদাবাবু বইতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতেন, এখন চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। চোখের কোন অসুখ হয় নাই। মা-ঠাকুরাণীর মত তাঁহারও কি মাথা খারাপ হইয়াছে। কর্ত্তার আমলের দোকান সে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

পরমেশ অনুভব করিতে চেষ্টা করিত, অন্ধকারের রূপ কি? ওই অন্ধ কিশোরী পূর্ণিমার চিরান্ধকারময় জগতের রূপ কি? আছে, রূপ আছে। সাত-রংএর দৈর্ঘ্য প্রস্থের বস্তুরূপ নয়। সে জগতে বস্তু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া ধ্বনিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, যেন প্রলয়ের অন্ধকার হইতে প্রবাহিত হইতেছে ধ্বনির তরঙ্গ, শব্দের কল্লোল; সেই ধ্বনি হইতে গড়িয়া উঠিতেছে নব নব শব্দ-মূর্ত্তি, সঙ্গীতের সুরজালের মত।

অন্ধকারের রূপ ধ্যান শেষ করিয়া যখন সে চোখ মেলিত, বিচিত্র বর্ণময়ী পৃথিবী তাহাকে নব আকর্ষণে টানিত। যে গাছটির দিকে সে কখনও চাহিয়া দেখে নাই, তাহারি পুষ্পিত পুঞ্জিত শ্যামলতায় কি স্নিগ্ধ শ্রী! কি নব মূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য চারিদিকে—গলির বাঁক, কলের কলটা, দোকানের বাক্সগুলি, ডাষ্টবিন্—সব বস্তু-মূর্ত্তিতে নবসৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইত।

পরমেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল।

নবনববর্ণপ্রকাশিনী বস্তু-রূপময়ী আলোকোজ্জ্বলা পৃথিবী একবার তাহাকে ভোলায়, দুই চক্ষু ভরিয়া সে রং ও রেখার সৌন্দর্য্য পান করে; আবার অন্ধকারের অরূপ মহারহস্য

তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, সে সব ভুলিয়া অন্ধকার ধ্যান করিতে বসে।

কোন বন্ধু যদি তাহাকে বলিত, এই মানসিক দ্বন্দ্ব এই অন্তরের বেদনা হচ্ছে অন্ধ পূর্ণিমার প্রতি তার সমবেদনাময় প্রেম, পূর্ণিমাকে পাইবার জন্য গভীর ব্যাকুলতা, তাহা হইলে সে বন্ধুর সহিত তাহার সারা জীবনের জন্য বিচ্ছেদ হইত, সন্দেহ নাই।

যে দেবতা জন্মমৃত্যু আলোকঅন্ধকারের ভিতর দিয়া অরূপ হইতে রূপে, রূপ হইতে অরূপে বিশ্ব জগৎ ভাঙিয়া গড়িয়া চলিয়াছেন, তিনিই সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

বর্ষার ধারা শেষ হইয়াছে; আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না, নীল সিল্কের ঘেরটোপ হইতে স্বপ্নময় আলোর বন্যা।

বিহ্বলের মত পরমেশ বহুক্ষণ ছাদে ঘুরিল; আলোর মায়ায় চোখ বোজা যায় না, ইচ্ছে করে নয়ন যেন কখনও না নিমীলিত হয়।

রাত গভীর হইয়া আসিল। পাড়া ঘুমন্ত; গলি নিঝুম; মায়ালোকময় পথ।

ছাদ হইতে নামিয়া সে জনহীন নিঃশব্দ পথে ঘুরিতে লাগিল। এতদিন যে কামনাকে সে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল আজ সে জাগিয়া উঠিয়াছে, জ্যোৎস্নার সোনার কাঠির স্পর্শে অন্তরের রুদ্ধগৃহে সে রাজবালা জাগিয়া উঠিয়াছে।

সে পূর্ণিমাকে ভালবাসে। এই কথাটি আকাশভরা জ্যোৎস্নায় সে গভীর আনন্দে অনুভব করিল। শুধু অনুভব করিয়া সে তৃপ্ত নয়, সে কথাটি তাহাকে বলিতে চায়।

সাদা বাড়ীটি জ্যোৎস্নায় ঝকমক করিতেছে। বাড়ীটার চারিদিক কতক্ষণ সে ঘুরিল। তারপর ধীরে ধীরে সিড়ি দিয়া দোতলা পার হইয়া ছাদে গিয়া পৌছিল।

বেতের একটি লম্বা চেয়ারে নীলকুশানে মাথা ঠেকাইয়া পূর্ণিমা ছাদে একা বসিয়া। তাহার পাশে টবগুলিতে নানা ফুলের মেলা।

জ্যোৎস্না-উদাস শরতের সুনির্ম্মল শুভ্র রাত্রির মত পূর্ণিমা উন্মনা বসিয়া।

'আমি এসেছি।'

'জানতুম, তুমি আসবে।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'তুমি আমাকে গ্রহণ কর।'

তপ্ত কম্পিত হস্তে স্নিগ্ধ শীতল আঙুলগুলির স্পর্শ।

কিছুদিন পরে পাড়ার সবাই অবাক হইয়া দেখিল গলির ছোট মনোহারী দোকানটা বড় রাস্তার মোড়ে এক বড় ঘরে উঠিয়া গিয়াছে, নিউ মার্কেটের দোকানের মত সুন্দর সাজান, নানা জিনিষভরা। পুরাণো সেঁতসেঁতে ঘরটা ছাড়িয়া যাইতে যদুর বিশেষ দুঃখ হইয়াছিল, নূতন দোকানের জাকজমক ও বিক্রির ধূম দেখিয়া সে দুঃখ সে শীঘ্রই ভুলিল। এখন দোকানের কাজের ভিড়ে তার একটুও সময় নাই।

———

অবশেষে

শ্রীবিষ্ণু দে

ছেয়েছিলো সারা ঘর কম্প্রস্নায়ু স্তব্ধতা অটল।
হৃদয়ে আমার ব্যগ্র ভয় কাঁপে—লাঞ্ছনা কি আছে ?
আকাশে থমকি' সন্ধ্যা মুখে তব ঢেলেছে রক্তিমা।
স্তব্ধ বসে' প্রতীক্ষায় তোমাকে যে আজো ভালোবাসে।

রণক্ষেত্রে পদপাত করে' চলে সশব্দে মিনিট।
ছত্রভঙ্গ হৃদয়ের কথাগুলি শুয়ে' আছে ভূয়ে।
পৃথিবীর যতো ভার বহে' আনে প্রতিটি মিনিট,
আনে যে আগামী তব দ্বার দেখিবার সংশয়ে।

মনে হয় মরস্বর্গে বারাণ্ডার উপরে দাঁড়ায়ে',
প্রতীক্ষা করিয়া চলি যদি কভু ডাকে বেয়াত্রিচে।
হৃদয়ে উন্মুখ আশা উদ্ধায়িত, দুহাত ছড়ায়ে'
এদিকে রয়েছে দেখি কল্পান্ত যে দুয়ারের নিচে।

চিত্ত হলো মৃতপ্রায়, অসাড় নীরব অন্ধকারে।
অকস্মাৎ ফুটে' ওঠে মদির রজনীগন্ধা শত।
অকস্মাৎ ফুটে' ওঠে কালো নীল ঠেলে শত তারা।
তোমার স্পর্শের নীড় খোঁজে মন আনন্দ-আহত।

তোমার কথার পাখা নিল প্রিয়া আমারে আকাশে,
নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
নিল মোরে আন্দোলিত রজনীগন্ধার শুভ্রবনে।···
অন্ধকারে চোখে তব নির্ভরের মাধুরী ঘনায়।

আশ্চর্য্য এই সাধুর ভাবটি। মুখে দুর্ব্বাক্যের স্রোত চলিতেছে,—যে-কেহ কাছে দাঁড়াইয়া শুনিলে ভাবিবে যে তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নি শর্ম্মা,—ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের ভাবেই একজনের প্রতি তাঁহার এই কটু সম্ভাষণ বাহির হইতেছে,—কিন্তু তাঁহার এই বাক্যবাণ যাহার উপর আসিয়া লাগিতেছে তাহার প্রাণের মধ্যে পরম প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন ভাবেরই উদ্দীপন হইতেছে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম সেদিন বৈদ্যনাথ ইঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, অর্থাৎ ওঁর কি রাগ আছে। উনি যে সিদ্ধ পুরুষ,—ইহা যে কেমন সত্য তাহা আজ এখন প্রত্যক্ষই অনুভব করিলাম। এ কি অদ্ভুত ভাবসিদ্ধি,—দুর্ব্বাক্যের মধ্য দিয়া তিনি আমার প্রাণের মধ্যে অমৃত সিঞ্চন করিলেন। কে ইনি? আমার যেন কত কালের, কত প্রিয়তম বন্ধু,—আপনার জন। যিনি এই প্রথম সম্ভাষণেই আমাকে একেবারে তাঁহার প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইলেন।—তারপর সেদিনের কথা আরও কিছু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আরও কতকটা বলিব।

ওরে শালা,—বলনা, কি কত্তে এখানে এলি? শালা, তুমি আমার সঙ্গে মাংটামো কত্তে এসেছ,—সাধু ঘাঁটতে এসেছ—হারামজাদা তোর সর্ব্বনাশ হবে যে রে—বল শালা বল?—কি মনে করে বল!

এক একটি অপ্রীতিকর বাক্যের মধ্যে মহাপ্রীতির উৎস অনুভব করিতেছিলাম যখন তিনি থামিলেন আমি আনন্দের নেশায় টলমল, আমার গা দুলিতে লাগিল। একবার সুমুখে একবার পিছনে দুলিতে দুলিতে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি কি যে বলিলাম তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম না,—কিন্তু তিনি তাহার পর যাহা বলিলেন তাহা আমার মনে আছে।

তন্ত্রমন্ত্রের সাধন দেখতে এয়েছ শালা, জোচ্চোর। মতের উপর তোর শ্রদ্ধা নেই,—ভক্তি নেই। আন্তরিক

টান নেই তার সাধন প্রণালী দেখবার তোর কি অধিকার রে শালা চোর। তোকে কে তা দেখাবে? হ্যাঁ,—বল

শালা প্রণালী পদ্ধতি, প্রকরণ দেখে তোর কি ফল হবে ?

তাও ত বটে, প্রকরণ, প্রণালী, বা সাধন পদ্ধতি দেখিয়াই বা আমার কি লাভ হইবে ?—তার সিদ্ধির ফল যা তার সঙ্গে ত আমার সিদ্ধির কোন ভেদ নেই, সেই অদ্বয় চৈতন্যে, নিত্যানন্দ ভাবে স্থিতি, আত্মায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি নাই বা দেখিতে পাইলাম তন্ত্রমতের সাধনপদ্ধতি।

এই ভাবের কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল। তিনি আবার আরম্ভ করিলেন, এই শালা অমাবস্যার রাতে একলা শ্মশানেতে মরার বুকের ওপর বসে জপ করতে পারবি ? তুই মদ খেতে পারবি, বল শালা,—মাছ মাংস তৃপ্তি করে খেতে পারবি,—সেঁটে খেয়ে দেখে, কোমরে জোর করে ন্যাংটো হয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গে লাগতে পারবি ? তারপর উঠে নির্ব্বিকার চিত্ত হয়ে চন্দ্রামৃত পান করতে পারবি ? শালা তুমি তন্ত্রের সাধন দেখতে এসেছ শালা,—কীট !

ভৈরবনাথের কাছে শুনেছিলাম উনি অঘোরী,—তান্ত্রিক সাধনের কথা ইনি জানলেন কি করে। অবশ্য জানা আশ্চর্য্য নয়—তন্ত্রের ব্যাপারে এতটা সম্যক জ্ঞান ইঁহার যখন আছে—তখন আর ভাবনা কি ?—মনে বড়ই আনন্দ পাইলাম—পর পর তিনি নিজ গুণে সকল কৌতূহল মিটাইয়া দিলেন। সে অবশ্য শেষের দিকে।

আমরা কি সকল ব্যাপার জানিবার অধিকারী ? ভাবিয়া দেখিলে একথা বেশ বুঝিতে পারি, আগুবাড়িয়া আমরা অনেক অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাই, জিজ্ঞাসু হই, আবার তাই লইয়া বিজ্ঞের মত অনেক তর্ক বিতর্ক ও মতামত প্রকাশও করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এ কথাটা প্রায়ই মনে আসে না যে-বিষয়টি লইয়া আমি এতটা শব্দ করিতেছি, সেটির আলোচনায় কিম্বা সেই তত্ত্ব উপলব্ধিতে আমার কতটা অধিকার। আমি কতটা প্রস্তুত হইয়া এই গভীর তত্ত্ব বিষয় দর্শনে অগ্রসর হইয়াছি।

সাধন, আমাদের জীবন অর্থাৎ আমাদের জীবনে জ্ঞানকৃত, এবং অজ্ঞানকৃত যাহা কিছুই করিতেছি তাহাই ত সাধন। সংসার প্রবৃত্তি বা স্থূল কর্ম্মজীবনের সবটাতেই আমার প্রয়োজন, যেমন, চৈতন্য মার্গে, মনঃশক্তির সহায়ে সহজ নিবৃত্তির পথে এবং অধ্যাত্ম জীবনের প্রয়োজন। এই দুইটিই যতক্ষণ আমার পূর্ণ একটি জীবন বোধ না হইতেছে ততক্ষণ আমি কোন গভীর তত্ত্বে অধ্যাস লাগাইতে অনধিকারী। লাগাইলেই কি হয় ? চীৎকার করিয়া ডাকিলেই কি সাড়া পাওয়া যায় ? এখানে গলার জোরে কিছু হইবার নয়। বরং আওয়াজ খাটো করিয়া, লক্ষ্য স্থির করিলে অনেক বেশী কাজ হয়। কত ভাগ্য ফলে মানুষের স্বর নম্র হয়। বিজ্ঞান বা দর্শনের অভিমান বিষে জর্জ্জরিত মন একটা বিশাল আয়তন সত্তার আভাষ না পাইলে কি সহজে শান্ত হয় ? আমি দেখিতেছি মহাশক্তিমান একজন পুরুষের কাছে বসিলে আমাদের মত একজন শান্ত হইয়া নিজ অক্ষমতায় সচেতন হইতে পারে।

এখন এই মহান শক্তিধর মানুষটির মুখে পর পর যে কয়েকটি কথা শুনিলাম তাহাতেই আমার মনের বক্র গতি সোজা হইয়া গেল।

ওরে শালা, চল্‌ত, তোর বিদ্যে কতটুকু,—কটা পাশ করেছিস, কত বই পড়েছিস্ ?—

আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম,—আমার বিদ্যা কিছুই নাই,—যেটুকু পড়েছি তা পরিচয় দেবার মত কিছুই নয়, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে,—

ওরে, এ শালার আবার মৌখিক বিনয়ও আছে,—এ্যাঃ—বল দিকি ও সব ঢং ছেড়ে দিয়ে—তোর মনে এখনও পড়াশুনোর গোমোর আছে কিনা ?—সত্যি বলবিরে শালা, খবরদার, হাঁ।

আমি দেখিলাম যে তিনি আমার মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখিতেছেন,—বলিলাম, দেখুন, কখনও কখনও আমার একটু অভিমান আসে বটে কিন্তু তাকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিই নি। ছেলেবেলা থেকে দর্শন শাস্ত্র, আত্ম তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় যে যোগ সাধন, সে সম্বন্ধে পড়া শুনা বা আলোচনা করবার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল ছিল, আর তাইতেই এ পথে কিছু কিছু জ্ঞানের আভাষ যেন পেয়েছি মনেও হয় বটে কিন্তু আমার চিত্ত এখনও রাগ দ্বেষ মুক্ত হয় নি,—আকাঙ্খা লোভ লালসা এ সব ঠিক আগেকার মতই আছে,

আর এমন অবস্থা আমার ত হয়নি যাতে মনে হয় যে আমার সব পাওয়া হয়েছে কিম্বা স্থায়ী ভাবে আমার কর্ম্মশক্তি চৈতন্যমুখী হয়ে অবিচ্ছেদে সেই দিকেই যাচ্ছে,—কাজেই এমন অবস্থায় আমি যে মহা দুঃখিত। এই অনুভবটাই বেশী বেশী আছে একথাটি যে চাপা দিয়ে গেলি রে শালা, আমার কাছে মাটটামো ?—হ্যাঁ—

সে কথাও পূর্ব্বে আমার বেশী বেশী মনে হোতো বটে, এখনও হঠাৎ পূর্ব্ব-অভ্যাসের ফলে কখনও কখনও হয়ত মনে

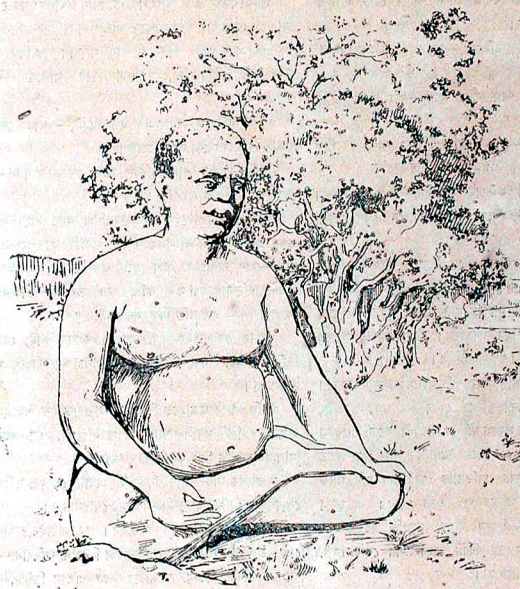

এলো,—তবে আমি বেশী হয়,—কেমন করে তা হোলে আমি অহংকার মনে মনে পোষণ করতে পারি।

ওরে শালা বেদো,—এ যে বেশ আসল দোষের কথাগুলো সামলে বললি,—সাধারণ লোকের চেয়ে তোর ধর্ম্মোজ্ঞান ও ভাবকেও কেটে দিই। এখন আমার বোধ হয় আর ও কথা বেশী মনে আসে না বা দাগ পড়তে পায় না।

কেন ?—কি তোর কাটান মন্তোর বলত দেখি ?—

সেটা এই, এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে জীব মূলে

এক হোলেও [illegible]র সকলকার জীবনের উদ্দেশ্য সমান নয়। প্রত্যেকের কর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন আলাদা, বিদ্বান, পণ্ডিত, মুখ্যু, চাষা-ভূষা, উঁচু-নীচু সমাজে যত জীব, সবাই পৃথক ভাবে জগৎ দেখছে, বিষয় ভোগ করছে কাজেই এখানে এ অহংকারের স্থান নেই যে আমি ওর চেয়ে বেশী জানি বা আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—তবুও একটু আছে কিনা, তার মধ্যে সামান্য রকমের একটু,—অবিশ্যি অত বড় করে দেখা না দিক্, বল শালা ঠিক করে—ওরি মধ্যে একটু আছে কিনা—

আমি বলিলাম,—হাঁ, বোধ হচ্ছে যেন আছে। ঠিক বলেছেন আপনি—ওটা যেন—

তিনি,—চীৎকার করিয়াই বলিলেন,—ঐ টুকু এককালে প্রকাশ হবে রে শালা, বিষের ছোবল মারবে এখন তোলা রইলো।

তোর গুরুগিরি করবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে কিনা টের পেয়েছিস? ঠিক বলবি,—বল শালা, কেমন ধরেছি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বিকট হাসিয়া আমার চক্ষের উপর তাঁর সেই তীব্র দৃষ্টির একটি আঘাত করিলেন। উহা আমার অন্তরে লাগিয়া আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলিল। বলিলাম,—

দেখুন আমার বিশ্বাস ইচ্ছা করিলেই গুরু হওয়া যায় না। মানুষ সমাজেও অর্থকরী বৃত্তিতে যেমন অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, বেশ্যার কাজে সকলে যথেচ্ছা পারদর্শী হতে পারে না তেমনি অধ্যাত্ম ধর্ম্মে যে কেউ ইচ্ছা করলেও গুরু হতে পারেন না। ভগবানের অভিপ্রায় এর মধ্যে যদি থাকে তবেই সিদ্ধকাম হয়ে মানুষে গুরু হতে পারে। এ ছাড়া আমার আরও একটি বিশেষ ধারণা সম্প্রতি হয়েছে—যে অধ্যাত্ম পথে গুরু এক সেই তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, হানি, হবে না, হতে পারে না।

তিনি, আবার বলিলেন,—শালা, শাস্তোরের ঢেকুর তুলছিস?—বল শালা, ঠিক করে,—ওরি মধ্যে, তাঁর শুভ ইচ্ছা কল্পনা করে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে দরকার হয়, তিনি যদি তেমনি বিধান করেন এই বোলে, একটু গুরুগিরির ইচ্ছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত, বল শালা ঠিক করে—এমনি একটু ইচ্ছে, সরু শিকড়ের মত ভিতরে জেগে আছে কিনা!—

বলিলাম,—সত্য—এটুকুও আছে যেন বোধ হচ্ছে, এখন।

সর্ব্বনাশ,—আমি কিন্তু এটা চাই না।

শুনিয়া তিনি এমন আকাশ-ফাটা হাসি আরম্ভ করিলেন বোধ হয় পাপহরার ওপার হইতে স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। আমি কিন্তু উঠিতে চাহিতেছি না, দেখিয়া তিনি বলিলেন,—কৈ উঠলিনা যে,—

আমি বলিলাম,—খাওয়ার ইচ্ছা নেই,—ক্ষুধাও নেই, তৃষ্ণাও নেই, সব যেন ভরে রয়েছে।

তিনি—যা, যা, শালা—নিয়ম রক্ষে করতে হবে না,—তোর জন্যে যে সকলে বোসে আছে।

আহারের পর পাপহরার তীরে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন প্রায় আড়াই প্রহর বেলা। অঘোরী আর সেখানে নাই,—তবে শ্মশানের কিছু দূরে এক ভৈরব ও ভৈরবী সামনাসামনি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। দুজনেই জোয়ান। অঘোরীর সঙ্গে এদের কি কিছু সম্বন্ধ আছে?—

আমার ইচ্ছা হইতেছিল একবার ওদিকে যাই, দেখি তিনি কোথায়, কিন্তু এই যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া আর যাইতে পা উঠিল না।

আমি অন্যদিকে যাইতে ছিলাম। পুণ্ডরীক, কালীবাড়ির ম্যানেজার, তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন,—চলুন আর আপনার আসনে গিয়া কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।

আহারের পর আমি নিকটেই এখান সেখান করিয়া বেড়াইতাম। বলিলাম,—চলুন একটু ঘোরা যাক্।

অনিচ্ছা সত্বেও পুণ্ডরীক চলিলেন। আমি যাইবার সময় সেই নবাগত ভৈরব দম্পতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এঁদের জানেন, অঘোরীর সঙ্গে এঁদের কিছু সম্বন্ধ আছে কি? অনুমান করিয়াছিলাম হয়ত চেনা হইবে। কিন্তু পুণ্ডরীকের মুখে শুনিলাম তা নয়,—এখানে এঁরা এই প্রথম এসেছেন। এখন আমরা দেখিলাম, আমাদের পিছনে পিছনে তারা দুজন আসিতেছেন।

দেখিয়া পুণ্ডরীকও দাঁড়াইয়া গেল। আমিও দাঁড়াইলাম।

তাঁহারা একজন আগে, একজন পিছে, আসিয়া পুণ্ডরীকের সুমুখে পৌছিলেন। ভৈরব প্রথমে কথা বলিলেন,—আমরা কামরূপ থেকেই আসছি, এখানে কিছু দিন থাকবার ইচ্ছা। শুনিয়া পুণ্ডরীক যেন বিশেষ চিন্তিত হইয়াই বলিলেন,—

আমরা কালীবাড়ির লোক, বক্রেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আপনি মন্দিরে গিয়ে, দেখেশুনে একটি স্থান ঠিক করে নিয়ে থাকতে পারেন,—এখানে সাধুসন্ত যাঁরা আসেন তাঁরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিয়ে থাকেন, কারো অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। বলিয়া পুণ্ডরীক, ঠাকুর-বাড়ির দিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারাও সেই দিকে চলিলেন। তখন পুণ্ডরীক ভৈরবকে লক্ষ্য করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাকে কি বলে আমরা ডাকবো।

তিনি বলিলেন—আমার নাম সিদ্ধ করালী। বলিয়া তিনি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমরাও রাস্তার বাঁকের দিকে চলিলাম।

বাঁক ফিরিয়াই এখানে একটি সুন্দর দৃশ্য চক্ষে পড়ে। একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ এবং বট গাছ, একসঙ্গে দুইটি। তাহার তলে ক্ষুদ্র একটি মন্দির। এত ছোট যে তাহার মধ্যে মানুষ বা কোন জীবজন্তু ঢুকিতে পারিবে না। কোন বড় মন্দির গঠন করিবার পূর্ব্বে,—প্রাচীন কালে এই ধরণের ছোট একটি মন্দিরের ছাঁচ মিস্ত্রিরা আগে গড়িয়া লইত। পরে ইহা বড় মন্দির গড়িতে সাহায্য করিত। বড় মন্দির গড়া হইয়া গেলেও ছোটটি আদর্শরূপে থাকিয়া যাইত। এ রকম অনেক স্থানেই আছে; আর, ইহার সঙ্গে অনেক কিছুরই সৌসাদৃশ্য আছে। বড় একটা কিছু মনোমত করিয়া গড়িবার পূর্ব্বে ছোট একটি আদর্শ গড়া এ প্রদেশের বহু প্রাচীন রীতি।

এই বক্রেশ্বর পীঠে এমন কোনও মহান শিল্প বা স্থাপত্যের চিহ্ন এখন নাই যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এস্থান শিল্প গৌরবে কোন সময় সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শ্যাওলা ধরা পুরাতন ক্ষুদ্র আদর্শটি দেখিয়া কত কথাই না মনে আসিতেছে।

কতকগুলি ডোমের মেয়ে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে,—সঙ্গে ছোট বড় কয়েকটি ছেলেও আছে। গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইতেছে, মনের আনন্দে বেড়াইতেছে আর গান করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে,

আর তাহার ভাষা লক্ষ্য করিলে, কাহাকেও দ্বিতীয়বার শুনিতে হইবে না। মনের আনন্দের সঙ্গে এই অশ্রাব্য কথাগুলি মিলিত হইয়া তাহাদের কণ্ঠ হইতে যেন অমৃত ঝরিতেছে! নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সে গান প্রাণকে আকর্ষণ করে। কি করুণ সুর!

ফুল-বেচা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্তে মোর বড় ব্যথা বাজে,
ফুলেরে বেচিতে যবে আসে মোর কাছে।
একটি ফুলের দাম দিতে এ' ভুবনে,
নিত্য সোনা ঢেলে দেয় সূর্য্য বনে বনে।
ফুলের জাগাতে ঘুম কাননে প্রভাতে
পাখীতে শোনায় গান। গোধূলি-আভাতে
কিরণের ডানা চাঁদ স্বপনে ভরিয়া
ফুলের চোখেতে ঘুম দেয় বুলাইয়া।
বিশ্বের সকল ভালোবাসা,
মধু হ'য়ে পুষ্প-বুকে বাঁধিয়াছে বাসা।
সেই ফুল ওরা কিনা নিত্য ছিন্ন করে,
বেচিবারে পথে পথে শুধু অর্থ তরে!

সন্ধ্যার চিকণ বৃন্তেতে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যার চিকন বৃন্তেতে
ফুটিয়া উঠেছে আজ চাঁদের পুষ্পেতে।
কিরণ-সুরভি-সুরা-ধারা,
পাইনের শ্যামল অধরে
উছলিয়া পরে।
নিকটে রয়েছে যারা
মনে হয় তারা যেন সরে গেছে দূরে
কাহিনীর অবাস্তব-পুরে।
ছুঁতে ভয় হয়, পাছে
স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,
পাছে তারা নাই, শুধু ছায়া পড়ে আছে
এই কথা মনে পড়ে যায়।
চন্দ্র-পুষ্পের সুরভিতে
চিত্ত মোর চাহে শুধু ঘন নিঃশ্বসিতে॥

পূজারীর বৌ

—গল্প—

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত পৃথিবীকে এত রাত্রে শুধু কয়েকটি রহস্যময় শব্দের সাহায্যে চিনিতে হয়। কাদম্বিনীর চোখে ঘুম নাই। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কান পাতিলে সে রাত্রির প্রত্যেকটি দুর্ব্বোধ্য ভাষা শুনিতে থাকে।

ঝিঁঝির শব্দ এমনি একটানা বিরামহীন যে থাকিয়া থাকিয়া আপনা হইতে তাহার শুনিবার অনুভূতি বিরাম নেয়। চেষ্টা করিয়াও আর যেন ডাক শোনা যায় না। ঘরের পিছনে নিমগাছটার পাতায় সহসা বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যায়, শুকনো আমপাতাগুলি উঠানের একপাশ হইতে অন্য পাশে উড়িয়া যাওয়ার সময় যেন তাহারা প্রতিধ্বনি করে। দূরে শিয়াল ডাকিয়া ওঠে। তাদের আর্ত্তকণ্ঠ নীরব হইবার পর বহুক্ষণ অবধি গ্রামের কুকুরগুলির চীৎকার থামিতে চায় না। কাছেই কোথায় একটা প্যাঁচা বীভৎস চীৎকারে রাত্রিকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কদর্য্য করিয়া তোলে। খানিক পরে অদূরে বড় রাস্তায় গরুগাড়ীর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ওঠে, গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়।

এবং অতি অকস্মাৎ রাত্রির এই সব নিজস্ব শব্দকে ছাপাইয়া উঠিয়া, কাদম্বিনীর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ তুলিয়া দিয়া, প্রতিবেশী রমেশ হাজরার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে।

কাদম্বিনীর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। রমেশ হাজরার বৌ ছেলে মানুষ, তার ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হয়। ছেলেটা অনেকক্ষণ কাঁদে। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনীর মাথার মধ্যে তার চেতনা নির্ভরহীন হইয়া যায়। একটা অদ্ভুত সমতলতার অনুভূতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়া তাকে একপাশে টলাইয়া ফেলিয়া দিতে চায়। কাদম্বিনী সভয়ে চৌকীর প্রান্ত দুই হাতে প্রাণপণে চাপিয়া ধরে।

প্রকৃতপক্ষে রমেশ হাজরার ছেলেটার কান্না শুনিবার আশঙ্কাতেই বাসন্তী অমাবস্যার রাত্রিটি কাদম্বিনীর কাছে বিনিদ্র ও শব্দময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। রমেশের বৌ ছেলে হওয়ার সময় এখানে ছিল না। বাপের বাড়ী গিয়াছিল। মাসখানেক আগে চার মাসের ছেলে কোলে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তার কয়েকদিন পরেই তার ছেলের কান্না কাদম্বিনী গভীর রাত্রে প্রথম শুনিতে পায়।

আপনার অসহ্য মনোবেদনা নিয়া কাদম্বিনী সেদিন ঘরের বাহিরে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুপদ অনেক বলিয়াও তাহাকে ঘরের মধ্যে নিতে পারে নাই। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া কাদম্বিনীর পাশে বসিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মাটীর প্রাচীরের ওপাশে শোনা গিয়াছিল ক্ষীণ কণ্ঠের কান্না।

কাদম্বিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আতঙ্কে উত্তেজনায় দিশেহারার মত স্বামীকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

'ওগো, খোকা কাঁদছে। শুনছ? ওগো তুমি শুনছ!'

গুরুপদ বলিয়াছিল, 'রমেশের ছেলে কাঁদছে কাছু। অমন কোরোনা। ভয় কি!'

কাদম্বিনী অনেকক্ষণ তার কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বিস্ফারিত চোখে দু'বাড়ীর মাঝখানে প্রাচীরটার পাশে আনারস গাছের ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বার বার শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল 'ওগো না, আমার খোকা কাঁদছে। আমি স্পষ্ট শুনছি আমার খোকার গলা,—ওই ঝোপের মধ্যে কাঁদছে। ওই শোন, শুনছ? আমার খোকার গলা নয়?'

তারপর হঠাৎ উন্মাদিনীর মত উঠানে নামিয়া গিয়া সে আনারসের ঝোপটার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। গুরুপদ তাকে ধরিয়া রাখে। সহজে কি তাকে আটকানো গিয়াছিল। নিরুদ্দেশের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খোকা তার উঠানের পাশে ঝোপের মধ্যে কান্না আরম্ভ করিয়াছে মনে করিয়া

শোকাতুরা শীর্ণা মেয়েটির দেহে কোথা হইতে বিস্ময়কর শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল কে জানে।

'ছাড়ো, নিয়ে আসি। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। নদীর ধার থেকে খোকা আমার এতদূর এগিয়ে এসেছে, এইটুকু ওতো আসতে পারবে না।'

'ছাড়া পাওয়ার জন্য বেশীক্ষণ স্বামীর সঙ্গে সে যুঝিতে পারে নাই।'

সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া গুরুপদর বুকে এলাইয়া পড়িয়াছিল। সেই তার প্রথম মূর্চ্ছা। শেষে রাত্রির আগে সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই।

রমেশ হাজরার বৌকেই ছেলে কোলে উঠিয়া আসিয়া কাদম্বিনীর সেবা করিতে হইয়াছিল। অচৈতন্য স্ত্রীর শিয়রের কাছে বিছানায় পা গুটাইয়া বসিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে শোয়াইয়া তাকে হাতের চুড়ি বাজাইয়া পাখা নাড়িতে দেখিয়া গুরুপদর কি মনে হইয়াছিল বলা কঠিন। ঘরের আলোটা যে শুধু তার চোখেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল এটা ঠিক।

গ্রামের জমিদার মহীপতি বসাক। গুরুপদ তার পিতার আমলে প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরের পূজারী। মন্দিরে রাধাশ্যামের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপরূপ। নিকষ কালো পাথর কুঁদিয়া এ নিলন মূর্ত্তি কোন শিল্পী গড়িয়াছিল আজ আর তাহা জানা যায় না। কিন্তু তার প্রতিভা বিগ্রহের মধ্যে আজো বাঁচিয়া আছে। দিনের পর দিন পাথরের দেবতা গুরুপদর চিত্তহরণ করিতেছিল। মন্দিরে যথারীতি পূজা ও আরতি করিয়া, ভোগ দিয়া তার সাধ মিটিত না। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া যখন তার বাড়ী যাওয়ার অবকাশ, টাকার বিনিময়ে দেবসেবার সাময়িক বিরতি, তখনও অনেক সময় সে বহুক্ষণ ধরিয়া বিগ্রহের সামনে চুপচাপ বসিয়া থাকিত। হৃদয়ানন্দের বিনিময়ে দেবতাকে বিনামন্ত্রে বিনা গন্ধ-পুষ্পে বিনা ধূপ-চন্দনে পূজা করিত।

পরদিন মন্দিরে যাইতে তার দেরী হইয়া গিয়াছিল। মহীপতির বিধবা বোন ভাবিনী একটু পূজা-পাগলা। জাতিতে তাঁতিনী বলিয়া বিগ্রহের কাছে ঘেঁষিবার অধিকার তার ছিল না। মন্দিরের একটা চাবি কিন্তু সে আঁচলে বাঁধিয়া নিয়া বেড়াইত। বিগ্রহকে সেও বোধ হয় ভালবাসিয়াছিল। কাছে না যাইতে পাক মধ্যে মধ্যে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া চুরি করিয়া দূর হইতে রাধাশ্যামকে দেখিবার সাধ সে দমন করিতে পারিত না। ভোরে মন্দিরে আসিয়া গুরুপদর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে সেদিন সে এমনি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎটা আগাগোড়া শুনিয়াও প্রথমে তার একবিন্দু সহানুভূতি হয় নাই।

পূজা শেষ হইলে কিন্তু বলিয়াছিল 'কথাটা ভাল নয় ঠাকুর মশায়, দুটো শোক মনে পুষে রেখেছে, তারপর ভারি মাসে মূর্চ্ছোটা হ'ল। শুনে থেকে মনটা কেমন করছে। আপনি এক কাজ করুন, কাদুদিদির নামে সঙ্কল্প ক'রে দু'টো ফুল দেবতার পায়ে ছুঁইয়ে সঙ্গে নে যান। কাদুদিদির কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখবেন।'

কাদুর কোল শূন্য হইয়া যাওয়া বন্ধ করার জন্য, কাদুকে শান্তি দিবার জন্য, দেবতার সাহায্য গুরুপদ অনেকবারই চাহিয়া ছিল। দেবতা তাহার কামনা পূর্ণ করেন নাই। তবু, ভাবিনীর কথায় গুরুপদ ব্যাকুল সাগ্রহে পুনরায় মনের কামনা নিবেদন করিয়া দেবতার পায়ে ফুল ছোঁয়াইয়া নিয়া গিয়াছিল।

মনে মনে কোন দেবতাকেই কাদম্বিনী আর ভালবাসিত না। ঘর খালি করা, কোল খালি করা, বুক খালি করা শোক যাঁরা দেন তাদের কাদম্বিনী ভাল বাসিবে কেমন করিয়া? তবু, ফুল পাইয়া তাহার উপকার কম হয় নাই। বিকালের দিকে উঠিয়া সে গুরুপদকে খাইতে দিয়াছিল, ওপাড়ার কানুর মার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গা দুইয়া কিছুক্ষণ আহ্নিক করিতেও বসিয়াছিল। রাত্রে সকাল সকাল শুইয়া সেই যে সে ঘুমাইয়াছিল সমস্ত রাত্রি একবারও তার ঘুম ভাঙ্গে নাই।

তারপর কয়েকদিন তার নিস্তেজ শান্ত ভাবটি বজায় ছিল। পাশের গ্রামে গুরুপদর এক মাসী থাকিত, গুরুপদ নিজে গিয়া মাসীকে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল। দু'বেলা রান্নার কাজটা মাসীই করিত, কিন্তু গো-সেবা, স্বামী সেবা আর ঘর দুয়ার সাফ করার কাজে কাদম্বিনী তাকে হাত দিতে দিত না। মাঝে মাঝে পুকুর ঘাটে গিয়া সে বাসন মাজিত। কলসী ভরিয়া জলও আনিত। বাগান দিয়া যাওয়া আসার সময় চকিত

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ডুপাশে চাহিয়া দেখিত। তার যেন মনে হইত বাড়ীর আনাচে-কানাচে, বাগানের গাছের আড়ালে তার হারানো ছেলে দুটিকে সে হঠাৎ এক সময় দেখিতে পাইবে।

মাসী বলিত—ভারি কাজ, নাই বা করলে বৌমা? পোড়া গতর নিয়ে আমি তবে রয়েছি কি জন্যে! টুকিটাকি কাজ করতে চাও কর, আর নয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করে খাও। কম কাঁথা চাই কি! শেষে দেখো কাঁথার জন্যে কত ভুগতে হয়। ক্ষেমির মেয়ে হবার আগে ওকে কত বললাম, বললাম ও ক্ষেমি, শুয়ে বসে দিন কাটাসনে মা এই বেলা য'খানা পারিস সেলাই করে নে। তা মেয়ে কথা শুনলে না,—ওমা অমন হু হু করে কেঁদে উঠলে কেন বৌমা। কেঁদোনা বাছা, কেঁদোনা কাঁদতে নেই। অমঙ্গল হয়।'

কাদম্বিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল 'কাঁথা দিয়ে কি হবে মাসীমা? কাঁথায় কে শোবে? কাঁথা যে আমার একবারও পুরোনো হতে পেলনা মাসীমা?'

মাসী অবশ্য তাকে যথারীতি আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছিল কিন্তু কাদম্বিনীর আশ্বাস পাওয়ার অবস্থা নয়। চোখের সামনে সূর্য্য ওঠে, চোখের সামনে অস্ত যায়। জগতের সর্ব্বোত্তম বিস্ময়, সূর্য্যের উদয়াস্তে মানুষ বিশ্বাস করে। দু'দুবার কাদম্বিনীর জীবনের সমস্ত অবলম্বন তারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছে, আসিবার সম্ভাবনা পার হইয়া যাইবার পর, অনেক তৃষ্ণাতুর দিবারাত্রি যাপনের শেষে, অকালে। দুবারই তার চোখের সামনে জীবনের আনন্দ তার চোখের পলকে অস্ত গিয়াছে। উদয়াস্তের এই একত্র সমাবেশেই কাদম্বিনী বিশ্বাস করে। সে বুঝিয়াছে, ছেলে তার বাঁচিবে না। ছেলের জন্যে তপস্যা করিয়া অসময়ে সে মাতৃত্বের বর পাইয়াছে। তার মাতৃত্ব টিঁকিবে, ছেলে টিঁকিবে না, একি আর কাদম্বিনীর বুঝিতে বাকী আছে।

তারপর এক সময় রমেশের ছেলের একটানা কান্নার মাঝে মাঝে বিরাম পড়িতে লাগিল। খানিক পরে কান্না একেবারেই থামিয়া গেল। এতক্ষণে তার মায়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

কাদম্বিনীর জগতে আর লেশমাত্র শব্দ রহিল না। আপনার চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার স্তব্ধতা তার চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে কেবল গুরুপদর নিশ্বাস ফেলিবার শব্দ তাকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করিয়া দিতে লাগিল।

বসন্তকালের জোরালো বাতাস এক জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অন্য জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কাদম্বিনীর মনে হইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া তার শীত করিতেছিল। আঁচলটা সে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিল। রমেশ হাজরার ছেলে রাজ রাত্রে আবার কখন কাঁদিয়া উঠিবে ঠিক নাই। কয়েকদিন আগে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও ছেলেটাকে কাদম্বিনী মধ্যরাত্রে একবারের বেশী কাঁদিতে শোনে নাই। তবু প্রতি মুহূর্ত্তেই কাদম্বিনী তার কান্না শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঘুমের ঘোরে গুরুপদ খাপ ফিরিয়া শুইল। বাহিরে নিমগাছের ডালে প্যাঁচাটা আবার কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিল। হঠাৎ স্বামীর উপর কাদম্বিনীর অভিমানের সীমা রহিল না। দুটি সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিরাত্রে মানুষ যে কেমন করিয়া এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না। তার মনে হইল, গুরুপদ হয়ত কোনদিন দুঃস্বপ্নও ছাখে না। হয়ত ওর ঘুমের দেশেও তার খোকারা আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও উঁকি দিয়া যায় নাই। হয়ত এখন সোনার জ্যোতিভরা সুখের স্বপ্ন ওর চোখে মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কাদম্বিনীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। এতকাল স্বামীকে সে দেবতার মতই পূজা করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি সজ্ঞান মুহূর্ত্ত স্বামীর সুখ সুবিধার চিন্তায় ব্যয় করিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই তার দুর্ব্বিসহ মর্ম্মবেদনা যেন নিমেষে লঘু হইয়া আসিয়াছে। ধার্ম্মিক সংযত দেবপূজক স্বামীর ভালবাসা পাইয়া চিরদিন নিজেকে সে ধন্য মনে করিয়াছে। তার বারো বৎসর ব্যাপী বিবাহিত জীবনে এক দিনের জন্য স্বামীর প্রতি সমালোচনার ভাব তার মনে জাগে নাই। তবু আজ কাদম্বিনী সহসা তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিল। তার কণ্টকশয্যায় সুখনিদ্রায় নিদ্রিত মানুষটার উপর অশ্রদ্ধায় তার মন পূর্ণ হইয়া গেল।

তার এই সংস্কার-বিরুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব মানসিক বিদ্রোহকে

বাধা দিবার কোন চেষ্টাই সে করিল না। দিনের আলোয় সুস্থ মনে যে চিন্তার ছায়াপাত হইলে সে শিহরিয়া উঠিত, এখন রাত্রির অন্ধকারে সেই চিন্তাকেই তার দুঃস্থ উদ্বেগ-মথিত মন সযত্নে পোষণ করিয়া রাখিল। গুরুপদকে তার মনে হইল নির্ম্মম, স্বার্থপর; মনে হইল, যে দুঃখ ভগবানের দান বলিয়া এতদিন সে জানিয়া রাখিয়াছিল ভগবান তাহা দেন নাই, গুরুপদই তার দাতা। জানিয়া বুঝিয়া গুরুপদই তার জীবনে বার বার এই সর্ব্বনাশ আনিয়া দিয়াছে। দু'বার তাকে শেলাঘাত করিয়াও গুরুপদর সাধ মিটে নাই, পুনরায় সেই একই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছে।

শয্যা ছাড়িয়া কাদম্বিনী মেঝেতে নামিয়া গেল। দু'হাতের কনুই মেঝেতে স্থাপিত করিয়া করতলে মুখ রাখিয়া সে যেন একটা শারীরিক যন্ত্রণাই সহ্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইখানে, এই কঠিন মেঝের উপরে বিছানা পাতিয়া তার ছেলে দু'টিকে সে শোয়াইয়া রাখিত, চৌকীতে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুরুপদ করিত শাস্ত্র পাঠ। কাজে তার মন বসিত না, দশ মিনিট পর পর ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখিয়া গিয়া সে থাকিতে পারিত না, ঘুম ভাঙ্গিয়া কখন ছেলে তার কাঁদিয়া ওঠে শুনিবার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। শাস্ত্র পাঠান্তে গুরুপদ যাইত মন্দিরে। মন্দির হইতে ফিরিয়া রমেশ হাজারার সঙ্গে বসিত দাবা খেলিতে। অনেক রাত অবধি হয় মন্দিরে বসিয়া থাকিয়া নয় কারো বাড়ী আড্ডা দিয়া বাড়ী আসিত। তার ছেলের প্রাপ্য সময় ব্যয় করিয়া যে খাদ্য সে প্রস্তুত করিয়া রাখিত তাই আহার করিয়া এমনি নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় রাত কাটাইয়া দিত।

তার ছেলে মরিয়া গেলে তাকে সান্ত্বনা দিত গুরুপদ। নিজের দু'ফোঁটা লোক দেখানো চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া তাকে বুঝাইত, উপদেশ দিত, তার চোখের জলও মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। ছেলের মরণে এতটুকু দুঃখ হইলে একি গুরুপদ পারিত?

এই স্মৃতিই কাদম্বিনীর চিত্তকে দহন করিতে লাগিল সবচেয়ে বেশী। তার মত স্বামী যদি তার পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, আজ যদি সে স্বামীর শোকাতুর মূর্ত্তি কল্পনায় আনিতে পারিত, মনের জ্বালা বোধ হয় তার অনেকখানি

করিয়া ধরিয়া কাদম্বিনী সমালোচক শত্রুর মত গুরুপদর মুখের দিকে চাহিয়া স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর মুখ সে দেখিল না, দেখিল শুধু আপনার দৃষ্টির বিকার। তার মনে হইল, ঘুমন্ত মানুষটার মুখে রেখায় রেখায় তার স্বার্থপর অত্যাচারী প্রকৃতি রূপ নিয়াছে। তাকে নিয়া খেলা করিবার কৌতুককর সাধ মুখের ভাবে সুস্পষ্ট ফুটিয়া আছে।

কাদম্বিনীর হাত হইতে প্রদীপটা পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। প্রদীপের তেল চলকাইয়া তার হাত বাহিয়া বাহুমূল পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিল। স্বামীর মুখে আপনার বিভ্রান্ত চিত্তের আবিষ্কার তাহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিতেছিল তবু সে তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পৃথিবীতে তার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অবলম্বনকে অন্ধ আবেগের সঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল।

বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না যে বাকী জীবনটা তাহার এমনি ভাবে কাটিবে। এক মাসের মধ্যে শূন্য কোল তাহার আবার ভরিয়া উঠিবে, ছয় মাসের মধ্যে কোল খালি করিয়া ছেলেকে তাহার গুরুপদ নদীতীরে রাখিয়া আসিবে। মেঝেতে লুটাইয়া মনের সাধে ধূলা মাখিয়া কাঁদিবার অবসরও সে পাইবে না। তার চোখ মুছাইয়া তার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া গুরুপদ তাকে এই ব্যথায় তুলিয়া লইবে। নদীতীরে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য তার খোকাদের প্রত্যাবর্ত্তন সে রহিত করিতে পারিবে না।

কাদম্বিনীর মনে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের এই ভয়ঙ্কর ছবি ক্রমে ক্রমে এমনি স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে গুরুপদর মুখ তার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। নিজেকে সে দেখিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়া প্রাণান্ত স্বামীর বক্ষলগ্না পুত্রহন্ত্রী রাক্ষসীর রূপে। শিশুর ক্রন্দনে মুখরিত রাত্রিতে সে এক একটি শিশুকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে আর গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে।

জীবনে আর তার কাজ নাই, উদ্দেশ্য নাই।

কাদম্বিনী সরিয়া আসিয়া পিলসুজের উপর প্রদীপ নামাইয়া রাখিল। রমেশের ছেলের কান্নাকে উপলক্ষ করিয়া পর পর অনেকগুলি রাত্রি সে আপনার মৃত সন্তানদুটির সাহচর্য্যে কাটাইয়াছে, তবু বাঁচবার একটা ক্ষীণ সাধ গত রাত্রিতেও তার মধ্যে ছিল। এবার ছেলেটি তার বাঁচিতেও পারে এ আশা সে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। আজ আর আশা করিবারও তার সাহস ছিল না। ছেলে হয়ত তার বাঁচিতে পারে। ভগবানের রাজ্যে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আর ভাগ্য পরীক্ষার শক্তি কাদম্বিনী নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিলনা। যদি না বাঁচে? পলকে পলকে হারানোর ভয় বুকে পুষিয়া ছ মাস একবছর মানুষ করার পর যদি মরিয়া যায়? বাঁচিয়া থাকিয়া কাদম্বিনী তাহা সহ্য করিবে কি করিয়া?

সিন্ধুকের উপর পিতলের ঝিনুকটির দিকে শেষ বারের মত তাকাইয়া লইয়া কাদম্বিনী ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। গুরুপদর দিকে চাহিবার সাধ আর তাহার ছিলনা। স্বামীর সান্নিধ্য তার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তার বারো-বছরের ঘরকন্না, তার বারোবছরের স্বামী পূজা আর তার বারোবছরের সুখ-দুঃখের স্মৃতিভরা এই নীড় অতিক্রম করিয়া সে যেন কোন সুদূরতম অর্দ্ধচেতনার দেশে চলিয়া গিয়াছিল, যেখানে আপনার অসহায় একাকীত্বের অনুভূতি ছাড়া মানুষের আর কোন জ্ঞানই থাকেনা। পূর্ণচেতনার বাস্তব জগতে বহুবার পরিত্যক্ত ইচ্ছায় মানুষ যেখানে চালিত হয়।

মন্দিরের চাবী গুরুপদর কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিত। চাবিটি হাতে নিয়া দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী বাহিরে চলিয়া গেল। উঠানে দাঁড়াইয়া একবার শুধু সে ক্ষণিকের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর আগাইয়া গিয়া সদরের দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া গেল।

এ পাড়ায় মানুষ ভিড় করিয়া নীড় বাঁধিয়াছে। রাস্তার দুপাশে স্তব্ধ নিঝুম গৃহগুলি একটির পর একটি অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় কাদম্বিনীর কান্না আসিতে লাগিল। এই সব গৃহের অধিবাসী প্রত্যেকটি পরিবারকে সে চেনে। কোনবাড়ীতে তার মত অভিশপ্ত একটি নারীকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না। পুত্রশোক এ পাড়ায় অজ্ঞাত নয়, হয়ত কোন বাড়ীর অন্ধকার কক্ষে পুত্রশোকাতুরা জননী হয়ত এখন অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু তার ছেলের মত অজ্ঞাত কারণে, ঈশ্বরের দুর্ব্বোধ্য অভিশাপে কার ছেলে আজ পর্য্যন্ত মরিয়া গিয়াছে? গর্ভে সন্তান আসিলে ওদের মধ্যে তার মত

কোন অভাগিনী জানিতে পারিয়াছে, সুস্থ সবল সন্তান তাহার একদিন তারই কোলে সহসা শুকাইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিনের মধ্যে ধনুকের মত বাঁকিয়া মরিয়া যাইবে?

মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির জলে অমারাত্রির উজ্জ্বলতর তারাগুলি ঝিক ঝিক করিতেছে। মন্দির সোপানে দাঁড়াইয়া কাদম্বিনী কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দীঘির বিস্তারিত শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল, মরিবার মত প্রয়োজন ছাড়া এ দীঘিকে যেন ব্যবহার করিতে নাই। অপরাধ হয়।

মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া কাদম্বিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। মন্দিরের কোথায় কোন বস্তু রাখা হয় কিছুই তার অজানা ছিলনা। অন্ধকারে অল্প একটু হাতড়াইয়াই পিতলের সবচেয়ে বড় কলসীটি কাদম্বিনী আবিষ্কার করিতে পারিল।

কলসীতে জল ভরা ছিল। কাত করিয়া কাদম্বিনী জল ঢালিয়া ফেলিল। কলসী কাঁখে তুলিয়া আন্দাজে রাধাশ্যামের মূর্ত্তির দিকে মুখ করিয়া সে মনে মনে বলিল, তুমি আমার দুটি ছেলে চুরি করেছ। আমি শুধু তোমার একটি কলসী নিলাম। তোমার ক্ষমা চাইনে।

বেঙ্গল এক্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড।

এই যে মৎস্য শিকারীর সরঞ্জাম।

পোঃ বক্স নং ৮৯৬৩ কলিকাতা ফ্যাক্টরী বেলঘরিয়া, ই বি রেলওয়ে।

বঁড়শী, সুতা, ছিপ, হুইল ইত্যাদি বিশেষ সুবিধায় পাইবেন।

যুবাভোগ্য বসুন্ধরা

শক্তি সামর্থ্য, বল, অর্থ, প্রেম প্রভৃতি যাহা কিছু সুখের সমস্তই যৌবন সুলভ।

তবে বার্দ্ধক্য আসিতে দেন কেন?

রক্ত সতেজ ও বিশুদ্ধ রাখার অভাবেই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়।

প্লার্ণসের

ডাইজেষ্টিভ ও টনিক ট্যাবলেট

আপনার স্কন্ধ হইতে বার্দ্ধক্যের বোঝা নামাইয়া শরীরে সাহস ও ক্ষমতা সঞ্চারে আপনাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে।

সকল ডাক্তারী দোকানেই পাওয়া যায়।

কর্ম্ম-জীবন আনন্দ এবং আনন্দকে অধিকতর আনন্দে পরিণত করুন।

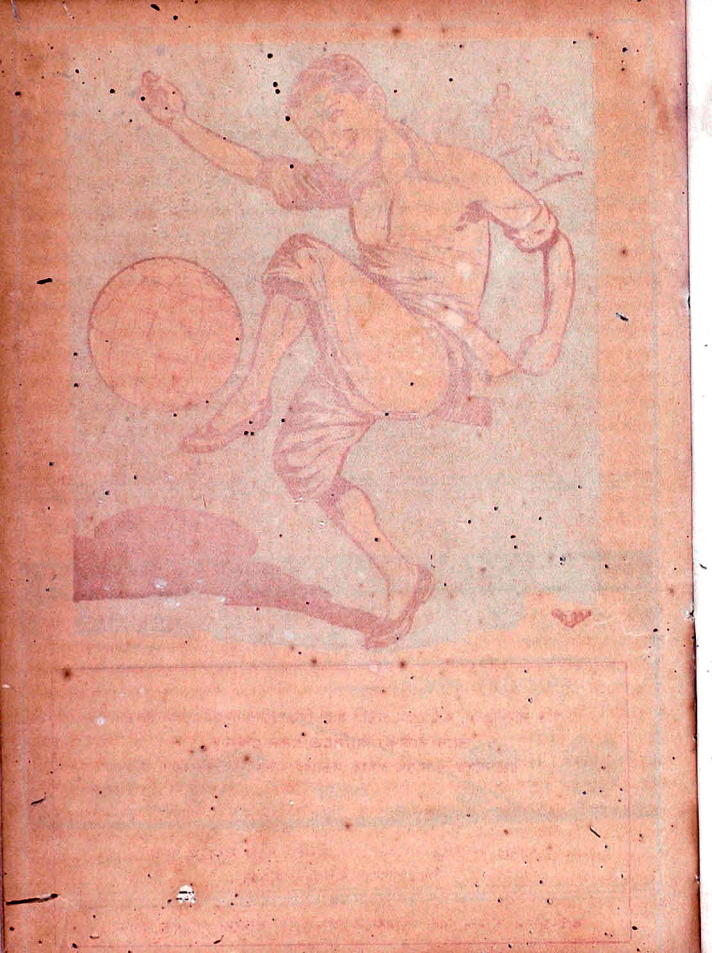

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও পুস্তক-পরিচয়

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একখানি চিঠি

এবার আমাকে যে সব বই পড়তে অনুরোধ করেছ তার প্রায় প্রত্যেকটাই ভাল লেগেছে। বিষ্ণু দে'র উর্ব্বশী ও আর্টেমিস, কেদারবাবুর দুঃখের দেওয়ালী, প্রবোধকুমারের মহাপ্রস্থানের পথে, অবনী রায়ের অনুচ্চারিত, বুদ্ধদেবের সানন্দা, আমার বন্ধু, যেদিন ফুটল কমল, এবং প্রেমেন মিত্রের উপনায়ন বিশেষ করে এইগুলো পড়ে আনন্দ পেয়েছি। একই ধরণের আনন্দ নয়, গোড়াতেই বলে রাখছি। লেখাও এক-শ্রেণীর নয়, প্রত্যেক লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, রচনার গুণের তারতম্যও রয়েছে। আমার দিক থেকেও বলে রাখছি যে একই মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে পর পর বইগুলো পড়িনি। খেয়াল-মাফিক্ পড়েছি। অথচ তুমি দীর্ঘপত্রে আমার মতামত জানতে চেয়েছ, তাই শুধু আমার জীবনীশক্তি সঞ্চয় করার জন্য একই পত্রে আমার মতামত জানাব। এতে একটা ভীষণ অবিচার করা হয় জানি—কিন্তু 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' মহাবাক্যটি স্মরণ করে একটু সান্ত্বনা পাচ্ছি। তুমি মাসিক সাহিত্যের কাবুলীওয়ালা; তোমার হাত থেকে কেউ কখনো নিষ্কৃতি কেউ পাবে না। তোমার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছি সনাতন উপায়ে, অন্যের প্রতি অবিচার ক'রে। বড় সাহেব বল্লেন, 'বাবু, তুমি একটি fool'—বাড়ি এসে বাবু গিন্নীকে বল্লেন, 'মেয়ে মানুষ জাতটাই ইডিয়ট্।'

প্রথমে যে বইটা ভালু লাগে নি তার সম্বন্ধে লিখি। মহেন্দ্র রায়ের 'কিশলয়' তরুণ-তরুণীদের খোসামোদ ক'রে লেখা। কৈশোর অবস্থাহিসাবে শৈশবের চেয়ে ভাল নয়, প্রৌঢ়ত্বের চেয়েও নয়। কৈশোরের চেয়ে শৈশবেই ভবিষ্যতের আশা বেশী থাকে। কিশোরকিশোরী ভাল কাজও করেন, মন্দ কাজও করেন। য়ুরোপ যুদ্ধের পর, যৌবন যৌবন করে ক্ষেপে উঠেছিল; কিন্তু এই যুবক-যুবতীর দলই ফ্যাশিষ্ট হল, ন্যাৎসী হয়ে ইহুদীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করছে। চায়না ও রাশিয়াতে তারাই আবার নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজ করছে। চোদ্দ পনের বছরের বাঙ্গালী ছেলেরা একজন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠে সাহেব বলেই মেরেছে। আমার বিশ্বাস যে কৈশোর অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা, সমাজের দিক থেকে, কেন না সব কিশোরই হবু—ফ্যাশিষ্ট। একধারে সর্দ্দারী করবার প্রবৃত্তি, অন্য ধারে না বুঝে সুঝে ভুল আদর্শের নামে সর্দ্দারের হাতে আত্ম সমর্পণ—এই বিরোধের ঘূর্ণীতে হাল্কা নৌকো বানচাল হয়। মহেন্দ্রবাবুর মত শিক্ষিত ব্যক্তির কাজ হল বয়ার ওপর লালবাতি দেওয়া। তা না ক'রে তিনি সত্যকারের বিপদগুলিকে কাব্যের আকার দিয়ে মধুর ক'রে তুলেছেন। ছেলেমেয়েরা এ বইটা খুব কিনবে, এবং হবে আদর্শবাদী! আর একটা কথা, কৈশোরে মন ব'লে কোন বালাই থাকে না, যেটুকু থাকে তার নাম মন নয়, সে মন একটা ইন্দ্রিয় মাত্র, কিংবা ইন্দ্রিয়ের দাস। তখনকার মানসিক কার্য্যাবলী অন্য অবস্থার মানসিক কার্য্যাবলীর অপেক্ষা ভাবচালিত। মন বাতিল করে ইন্দ্রিয়ভোগ ও ভাববিলাস কারুর কাম্য হতে পারে কি? কৈশোরের potentiality আছে, তাকে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন, কিন্তু ঐ প্রকার উচ্ছ্বাস পূর্ণ চিঠির দ্বারা হবে না। হবে না কেন? সে মুক্তি কাম্য নয়। উন্মুক্ত করতে হবে মনের দ্বারা। আমাদের তরুণ-তরুণীদের কি চাই জান? Obstinate Rigour—কঠোর সংযম—এ উপদেশ দেবার ভাষায় মাধুর্য্যের সঙ্গে কাঠিন্য থাকবে। মহেন্দ্রবাবুর ভাষা চমৎকার, কিন্তু একটু বেশী ভাল, মধুর, বেশী মধুর, মোলায়েম, চিনি নয় কেবল ন্যাকারিণ, সেইজন্য একটু তেতো লাগল। এই ভাষার উপযুক্ত বিষয় অন্য, ভাষা ও বিষয়ের লাগডাঁট শুনতে চাও, ত' সুরেশ চক্রবর্ত্তীর, তোমার নয় পণ্ডিচেরীর সুরেশের ঐন্দ্রজালিক পড়। যদি পড়ে থাক, আবার পড়। মহেন্দ্রবাবু মরমী কবির ভক্ত—মরমীর দরদী ভাষা!—মেটারলিঙ্কের ভাষা কি এই ধরণের ফেনিল? সে ভাষা অতিশয় সংযত, নেহাৎ যতটুকু না হলে চলে না, তাই। কিশোরীর দেহের মতনই economical, যদিও অতটা ল্যাঙ্গি পেঙে নয়। কিশোরকিশোরীর শিক্ষা

সম্বন্ধেও মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমি একমত নই। জের এই কথা বলা চলে—শিক্ষার একটি ছন্দ থাকা চাই, যেমন জীবনের আছে, দুই ছন্দকে কখনও মেলাতে হবে, কখনও বৈপরীত্যের দ্বারা ভারসাম্য ঘটাতে হবে। যখন আসবে উচ্ছ্বাসের যুগ তখন বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা তাকে উৎসাহিত করতে হবে, ছন্দের গতিকে সংহত করতে হবে, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। এ না করলে আজ না হয় দুদিন পরে এই কিশোর কিশোরীর দল বন্ধুর বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াবে, অকৃতজ্ঞ হবে, সর্ব্বনাশ হবে তখন।

বিষ্ণুর কবিতা নিয়ে পূর্ব্বাশায় একটা লম্বা প্রবন্ধ দিলাম, পড়ে দেখো। লেখাটা একটু এক পেশে হয়েছে, তবু সেখানে আমি বিষ্ণুর কবিতার দোষ-গুণ বিচার করবার চেষ্টা করেছি। তার কবিতার তিনটি গুণ লক্ষ্য করেছি—সে ছোট কবিতা লেখে, গ্যাজগ্যাজানি নেই, ভাব-বিলাস নেই, বাংলা দেশের পক্ষে মস্ত গুণ। সে আধুনিক ইংরেজী ও আমেরিকান কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত, এবং বেমালুম তাদের নতুন ছন্দ-রূপ গ্রহণ করেছে। গ্রহণ, অনুকরণ নয়, কেননা তার ভাববস্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই সব ছন্দে রূপায়িত হয়েছে, কোন পরীক্ষার প্রচেষ্টা নেই। এবং গোটা কয়েক কবিতা সার্থক হয়েছে—যেমন ধর উর্ব্বশী। দোষ এই যে সে এমন গোটা কয়েক উল্লেখ ইঙ্গিত করেছে, এলিউশন্ দিয়েছে, এমন দু'চারটি কথা প্রয়োগ করেছে যার শেকড় আমাদের মনের ভেতর নেই ও প্রবেশ করে নি, সহজে প্রবেশ করবেও মনে হয় না। দু একজন আমাকে বলেছেন, ওসব pedantry, পাণ্ডিত্য দেখান। হতে পারে হয় ত, কিন্তু আমার মনে হয় ডায়নার বদলে আর্টেমিস কথার ব্যবহারে একটা সুরগত সার্থকতা আছে। আর একটা দোষ এই যে সে অভিনব-রূপ গ্রহণ করলেও যাকে আধুনিক বলি তা হতে পারে নি। আধুনিকত্বের মূল কথা cerebration is substituted for emotionalism। বিষ্ণু ভাবুক কবি নয়, মরমী নয়, কিন্তু তাই ব'লে এলিয়টের মতন সে জ্ঞানরাজ্যের মহারথী নয়। বিষ্ণুর যুক্তশব্দগুলি বেশ সুরেলা। নানা দোষ থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে বিষ্ণুর কবিতা উপভোগ করতে হলে আমার কেদারা থেকে উঠে বসতে হয়।

বুদ্ধদেবের সানন্দা neat ও ঝক্‌মকে। সে যেখানে শেষ করেছে সেখানেই গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি। গোড়ার দিকে একটু ফেনান আছে, তখন বোধ হয় বুদ্ধদেব স্থির করেনি গল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। বীরেনকে আঁকতে গিয়ে সাহিত্যিকভক্তদের ওপর অতটা গালাগালি একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে—ওটুকু বাদ দিলে স্বীকার করতে হবে যে বীরেন একটি সুপরিচিত টাইপ, যার পেশা হল 'সিংহ শীকার।' সানন্দাও জীবন্ত হয়েছে। তার ধরণের মেয়ে বাঙ্গালী সমাজের একটি স্তরে হয়ত দুর্লভ নয়, যদিও আমি সেই শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত নই। Sensation mougering এর ভেতর একটা নিরর্থকতা থাকে যার ফলে জীবনটাই বিস্বাদ মনে হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় মানুষে নিতান্তভাব-প্রবণ হয়ে পড়ে, যে কোন একজন ব্যক্তিকে আশ্রয় করতে চায়, প্রথমে সন্ধ্যা, পরে মৃণ্ময়, পরে অবনী, এই চলন। প্রত্যেক সম্বন্ধটিই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সঞ্চয়কে না চিনেও সানন্দা বলত যে সে তার পুরাতন বন্ধু। সানন্দা বরাবর নিজেকে ঠকাচ্ছে, ক্ষণিকের জন্য। ডার্লিঙ জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়কেই অনন্ত-জীবন ভাবত, দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করত, তাই সে প্রকৃতই ডার্লিঙ, সানন্দার টাইপ, poor ineffectual girl মাত্র। কিন্তু তাকে poor বলতেই হবে। বুদ্ধদেবের নিষ্ঠুরতার অন্তরালে এই গুপ্ত সহানুভূতির সন্ধান পেয়ে আশান্বিত হলাম।

বুদ্ধদেবের বইখানির ১৪,২৬,২৭,৬২,৬৩ পাতাগুলি পোড়ো, বুঝবে ওর লিখবার ক্ষমতা। কিন্তু ১৫ পাতার প্রথম লাইনটা পড়লে বুদ্ধদেবের দুর্ব্বলতা কোথায় তাও বুঝবে। সে লিখছে, বীরেন সম্বন্ধে, 'একটু দেখলেই ভদ্র-লোককে দু' কাঁধ ধরে' ঝাঁকুনি দেবার প্রবল একটা লোভ হয়।' এ লাইনটায় বিদ্রূপ নেই, ক্রোধ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। বুদ্ধদেব একটু নিরাসক্ত হয়ে ঠাট্টা করে যাচ্ছেন, হঠাৎ নিজের ওপর সংযম হারালেন। ক্রোধের এ রকম আকস্মিক উৎপাত এরেলুনে নেই, আছে Brave New World এ। তবে সত্য কথা কি জান? আমারও ঐ রকম ঝাঁকুনী দিতে ইচ্ছে করে, তোমাকে, তবে আমি বুদ্ধদেব নই, আমাকে যা সাজে তাকে তা সাজে না, আর তুমিও বীরেন

নও, তুমি bore নও, bully। Bore এর ছবি এত সুখপাঠ্য হতে পারে বাঙ্গালী পাঠক বাংলা সাহিত্য পড়ে ভাবতে পারে নি। আবার বলি, সানন্দা খেয়ালের মাথায় লেখা, তাই অমন neat হয়েছে। কিন্তু neat হলেও slight।

বুদ্ধদেবের আরো দুটো বই পড়লাম। 'আমার বন্ধু' বইটা সানন্দার চেয়ে ভাল। ভবভূতিও 'ভক্ত', কিন্তু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও বন্ধুবাৎসল্যের জোরে বুদ্ধদেব তার প্রতি পাঠকের অনুকম্পা সৃষ্টি করিয়েছেন। যে দৃশ্যে ভবভূতি বুঝলে যে তার বন্ধু তাকে প্রবঞ্চনা করে আসছেন সে দৃশ্যটি ভারী করুণ। কিন্তু এই dramatic momentটিকে বুদ্ধদেব খুব সদ্ব্যবহার করেননি মনে হয়। যে ভবভূতিকে এতক্ষণ ধরে comic ভেবে আসছি তাকে tragic করে তুলতে হলে হয় প্রথম impressionকে ভোঁতা করতে হবে, না হয় বিরোধটা আরো তীক্ষ্ণ করতে হবে। বুদ্ধদেব এ দু'এর এক কাজও করল না। শেষরাত্রি (মাসীমা) গল্পের প্রবঞ্চনার ট্রাজেডীটা বিশ্লেষণ করলেই বুঝবে। একটা ভারী মজার কথা মনে হচ্ছে, আচ্ছা ভবভূতিরূপ নায়কের artistic conscience করলে মন্দ হত কি? যেমন আলাঁন পো করেছেন—জন উইলসন (?) গল্পে টেকনির্কটি মনে আছে?

বুদ্ধদেবের দ্বন্দ্ব ঘুচেছে তার 'যেদিন ফুটল কমল' বইখানিতে। কমলের কুঁড়ি ধরেছে, আর পঙ্কও নেই, জলও নেই! বইটা সত্যই ভাল, নিশ্চয়ই পড়বে আমার অনুরোধ। ভাল লেগেছে তার ভাষার উন্নতির জন্য, তার বক্তব্যের গাম্ভীর্য্যের জন্য, তার দোষ মোচনের জন্য এবং তার সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি সত্যকারের দরদের জন্য। বইটায় শেষের কবিতার অনেক ছাপ আছে, কিন্তু তা বুদ্ধদেবেরই লেখা বেশ বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের লেখার কোন গুণ এতে বাদ যায়নি, দোষ বাদ গিয়েছে, নতুন গুণ আশ্রয় করেছে। 'মা, ছেলে ও কবিতা' অধ্যায়টি পোড়ো atmosphereটা চমৎকার ফুটেছে। শ্রীলতার বৌদি একটি snob, বুদ্ধদেব তবু তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেনি। 'মা'টি খুব ভাল আঁকা হয়নি সন্দেহ হয়। তা ছাড়া বইটার কোন খুঁৎ নেই। মা ঠিক্ রক্তমাংসের নয়, তত্ত্ব ও জগতে মাএর প্রভাব দেখানই বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল। অমৃত-বাজারের পূজা-সংখ্যায় একটা ইংরেজীতে সমালোচনা দিলাম।

প্রেমেনের উপনায়ন শেষ করলাম। নামটির অর্থ শুনলাম উপনয়নের causative, অর্থাৎ initiation। বুদ্ধদেবের যেদিন ফুটল কমল ও প্রেমেনের এই বইটার পৃথক সমালোচনা করা উচিত—না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। যে কারণে একত্রে করছি তা পূর্ব্বেই লিখেছি। প্রেমেনের বইটা পড়ে আমার মনের যে ভাবগুলির উদয় হয়েছে তারই একটা অসংলগ্ন বিবরণ দিচ্ছি। যদি কখনও সুবিধে হয় গুছিয়ে লিখব। বলা বাহুল্য, প্রেমেন intellectual নয়, তার লেখা পড়লে বুদ্ধি চন্‌মন করে ওঠে না, কেবল হৃদয়টা হুলে ওঠে, চোখের কোনে জল আসে, সমস্ত প্রাণ সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। প্রেমেন দুঃখের দেওয়ালী সাজার না, সে দুঃখের প্রদীপ জ্বালায়, বাংলা দেশের কুটিরে কুটিরে যে প্রদীপ জ্বলে। তার মূলধন হল হৃদয়, যেমন বুদ্ধদেবের হল বুদ্ধি। অবশ্য ঐ কথা থেকে মনে কোরোনা যে প্রেমেন শুধুই কাঁদছে আর কাঁদাচ্ছে। দুঃখের মধ্যেও সে মাধুর্য্যের সন্ধান পেয়েছে, কালী, দেবু, দেবুর মা, এমন কি তার মাতাল বাবা, কে নয়? এমন কি ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, নকুড় দাস তার স্ত্রী, শেষে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত। এরা প্রত্যেকেই ভাল। বইটার মধ্যে অ-মধুর হল কেবল স্কুলের মাষ্টার, ড্রাইভার ও বাড়িওয়ালা অক্ষয়। অক্ষয় হয়ত মন্দ লোক ছিল না, ড্রাইভারকে বাদ দেওয়া যায়—বাকি থাকে মাষ্টার। মাষ্টারটি অস্বাভাবিক হয়েছে, প্রেমেন ঐ ধরণের চরিত্র হয়ত দেখেছেন—তাতে আসে যায় না। বুদ্ধদেবও মাষ্টার জাতকে ঘৃণা করে, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিকে সে ঘৃণা করে, কিন্তু standardisation ও মূর্খতার জন্য, তাদের অ-মানুষিকতার জন্য নয়। অ-মানুষিকতা—প্রেমেনের হৃদয় খুব বড় বলেই সে human, বোধ হয় all too human হয়েছে। বিদুর বাবার মাংসানী, জুয়োখেলা, চুরী করার মধ্যেও তার অনুশোচনা, আশাপ্রবণতা, ভাল হবার ঐকান্তিক ইচ্ছা, স্ফূর্ত্তি ফুটে উঠেছে, সেইজন্য ভদ্রলোকের ওপর রাগ হয় না, সে যে মানুষ 'সেই কথাই বারবার মনে ওঠে। নকুড় দাস, তার স্ত্রী, প্রত্যেকের বেলাই তাই, কেবল

মাষ্টার মশাইদের বেলা তাই নয়। আমি মাষ্টার বলেই আমার খারাপ লেগেছে তা ভেবো না। এ প্রকাশ নিষ্ঠুরতা প্রেমেনের করুণ সাহানায় বিবাদী সুর। গুরুচণ্ডালী দোষ হয়েছে; তবু ক্ষমা করা যায়। বুদ্ধদেব লিখলে রাগই করতাম।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার জিনিষ। দারিদ্র্যের প্রতি বুদ্ধদেব, প্রেমেন ও শৈলজানন্দের মনোভাব ও তার প্রকাশ সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ভাববার কথা। পার্থপ্রতিম দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে, কারণ দারিদ্র্য সে যা হতে চায় তাই পাওয়ার পথে অন্তরায়। সে চায় কবি হতে, অর্থাৎ অবসর, দারিদ্র্যের মধ্যে অবসর নেই, আছে কাজের ভিড়, সে কাজ আবার অমনিতা দূর করারই জন্য, মনের মতো কাজ নয়, কবিতা-লেখার জন্য যে প্রচেষ্টা তা নয়। প্রেমেনের বইএ বিনুর দারিদ্র্য বিনুকে গরবী কি অভিমানী করছে না, সে দেবুর বাড়ি গিয়েও অস্বস্তি ভোগ করছে না, দেবুর মাঁকে সে আপন করে নিচ্ছে, কেবল ড্রাইভারের অপমান সহ্য করতে সে নারাজ, সেজন্য ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দিলেই চলে। বুদ্ধদেবের পার্থপ্রতিম ছেলে বয়স থেকেই অত্যন্ত সচেতন শিশু ছিল শপথ করে বলা চলে। বিনু মোটেই আত্মচেতন নয়, প্রেমেন লিখছে যে বিনু 'অ-স্বাভাবিক' ছিল—সে অ-স্বাভাবিক ছিল না, তার চেতনার ক্ষেত্রটি উর্বর ছিলই না, নচেৎ অত সহজে কালিদের বাড়ি, দেবুদের বাড়ি কিংবা নকুড় দাসের বাড়িতে খাপ খেয়ে যেতে পারে? জোর করে বলতে পারি, বিনুর যে আশ্রমে যাবার আভাস দেওয়া হয়েছে সেখানেও বিনু মিশে যাবে। আত্ম-চেতনা নেই বলে বিনুর চরিত্রে বিরোধ নেই, সেইজন্য তার জীবন প্রণালী নিজের নয় সন্দেহ হয়। বিনু বাঙ্গালীঘরের লক্ষ্মীছেলে, সাধারণ ও স্বাভাবিক। তার এটুকু জীবনের ওপর অতপ্রকারের উপর্য্যুপরি ভীষণ আঘাত এলে কি হয়? সত্য কথা বোধ হয় এই যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হয় না প্রেমেনের বিশ্বাস, নচেৎ যে বিনু সেই বিনুই রইল কেন? শুধু পট পরিবর্ত্তন হল মাত্র। বিনুর চরিত্রে পরিণতি নেই, পরিবর্ত্তন আছে মাত্র—তার দাম সিনেমার টিকিটের, অবশ্য উচ্চশ্রেণীর,—entertainment tax এর জন্য আরো কিছু ধরে দেওয়া চলতে পারে। দাঁড়াল এই, humanityকে প্রেমেন এতটাই গ্রহণ করেও স্বীকার করে, যে তার পাশে দারিদ্র্যের নিজস্ব স্থান থাকে না। ভাল কথা; কেন থাকে কি থাকে না, থাকা উচিত কি উচিত নয়, এসব মতামত; প্রেমেন বলছেন নেই, মেনে নিলাম এবং মেনে নিয়ে উপভোগ করলাম। তবে সেই সঙ্গে বলব, যে প্রেমেন রিয়ালিষ্ট নয় এবং কোন সোশিয়ালিষ্ট পাঠক প্রেমেনের এই মনোভাব গ্রাহ্য করবে না। আমি জানিতাম—বুদ্ধদেব, প্রেমেন Realist schoolএর। তা মোটেই নয়, মোটেই নয়, মোটেই নয়, বুদ্ধদেব হলেন পুরোপুরি individualist, তার রিয়ালিজম্ হল বিষয়ের বিস্তার মাত্র, আর প্রেমেন হলেন humanist—পুরোপুরি রকমের। তাঁর রিয়ালিজমও তাই, অভিজ্ঞতার একটি স্তরমাত্র। সত্যকার realist হবেন কি জান? তার পদ্ধতি হবে বৈজ্ঞানিক ও তাঁর বিশ্বাস অটল থাকবে প্রকৃতির ওপর, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির অন্তঃপ্রকৃতিকে একদম বদল করবার ক্ষমতার ওপর। Zola তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে কেবল fidelity to natureএর ওপরই জোর দিয়েছিলেন, এখন নতুন রিয়ালিজমের সংস্কৃত মত হবে environmentalism—যেটি সোশিয়ালিজমের মূলসূত্র। A Realist must needs be a Socialist—পছন্দ না হয় রিয়ালিজমের বই পড়োনা, কিন্তু যা বললাম তার মধ্যে ন্যায়ের ফাঁকি পাবে না। ভেবেছিলাম বুঝি বা Realism এল, ভুল ভেবেছিলাম। এঁরা পুরাতনেরই বংশধর—petit bourgeoisie, তাই আমাদের এঁরা একটু Sentimental। প্রেমেন এক এক সময় নিজের সংযম হারায়—১০০ পৃঃ থেকে পড়। এ দৃশ্যটি melodramatic, দেবু মারা যাবার খবর শোনার পরই বাবাকে ধরে নিয়ে গেল! ১০৮—১০৯এর পাতায় বার পাঁচেক 'লীলা' কথাটি আছে, ভাল লাগ্‌ল না।

ভাল লাগল ১৩৫ পাতা থেকে। অতিশয় ভাল লাগল। যেদিন বিনু নকুড়দাসের পরিচিত হল সেদিন আমার পক্ষে শুভদিন। প্রেমেন স্থির সন্ধানী হয়েছে, তার লক্ষ্য অব্যর্থ হয়েছে, কলম তার আর ভাবের বেগে কাঁপছে না। একদমে বই শেষ হল, last sprint এর মতন। যে ঘোড়া এ রকম ছুটতে পারে last lapএ, তাকে আমি back করি, তার ওপর heavy bet ধরতে পারি। প্রেমেনের উপন্যাস ভাল বই। প্রেমেন সম্বন্ধে আরো লেখা উচিত, এইটুকু লিখে আমি সন্তুষ্ট হলাম না।

* * * *

প্রেমেনের লেখার পর কেদারবাবুর লেখা পড়া রাগমালা শোনার মতন। কেদারবাবুও হৃদয়বান ও humanist। কেদারবাবুর দুঃখের দেওয়ালীর অনেকাংশই আমার পরিচিত। হাসিমুখের চোখে যে অশ্রুকণা ভাসে তাকে মুক্তায় পরিণত করবার যাদুময় কেদারবাবু জানেন। কিন্তু কি হাসি জান? স্মিতহাস্য নয়, একেবারে বৈঠকী হাসি, guffaw, মজলিসী হাসি, খাঁটি আড্ডাধারীর মজলিস্, তাতে টিটকিরী নেই, চিপটিনী কাটা নেই, আছে toleration which is the consummation of practical wisdom and wide experience, বুঝেছ? তোমার আমার আড্ডায় হয় ঠাট্টা, পরনিন্দা, কিন্তু কেদারবাবুর বইএ যে আড্ডার সন্ধান পাওয়া যায় তাতে ঠেস্ দিয়ে কথাবার্ত্তা চলে না। কেদারবাবুর একটা মধুর philosophy of life আছে—তিনি, সন্ন্যাসী, ঠাকুর, দেবতা, পূজা-অর্চ্চনা মানেন না, তিনি মানেন গোটাকয়েক human values—এই যেমন স্বার্থত্যাগ, ঔদার্য্য, মনুষ্যত্ব, বীর্য্য প্রভৃতি। এরই পটভূমিতে তিনি নানারকমের ছোট ছোট বিশেষত মধ্যবিত্ত সংসারের ঘটনার মৌখিক (লিখিত নয়) বর্ণনা করেন। একধারে ছোট্ট ঘটনা, অন্যধারে তাঁর মতে চিরন্তন human and ethical values—এই foilটি একটু ন্যোটা, সেইজন্য তাঁর রসিকতাও broad হতে বাধ্য। ও ধরণের contrastএ সূক্ষ্ম intellectual witticisms সম্ভব হয় না। না হোক্ গে, মাঝে মাঝে প্রথম ভাগের উপদেশ স্মরণ করার বড় প্রয়োজন হয়। সেই moodএ যদি কেদারবাবুর কোন লেখা পাই, বড় ভাল লাগে। কেদারবাবু সব সহ্য করতে পারেন, শুধু পারেন না কাঁদ আর hypocrisyকে তা বড় বড় নাম নিয়েই তারা আত্মকনা, ধর্ম্মেরই হোক্ আর রিসার্চ্চেরই হোক্। কেদারবাবুর হৃদয়টা খুবই বড় এবং লোকটি ভারী সাঁচ্চা তাঁর লেখা পড়ে তাই মনে হয় তোমার মুখে শুনেছি, নিজেও দেখেছি তাই। অতএব তাঁর লেখা Sincere হবে না কেন? তাঁর One drop of tear can wash away all my intellectual opposition। আর একটা জিনিষ, তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় যে লোকটি প্রকৃতই উদাসী। কি করে ঐ রকম নিষ্কাম হওয়া যায় তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানাতে পার? না, আর লিখব না, চিঠি লম্বা হচ্ছে।

প্রবোধকুমারের মহাপ্রস্থানের পথে সত্যই একটা নতুন ধরণের ভ্রমণ কাহিনী। প্রবোধের উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যসঞ্চয় নয়, জীবনের প্রকৃতরূপটি দেখা। সে জন্য সে বেড়িয়ে পড়ল ছুটে, মহাপ্রস্থানের পথে, যে পথে সভ্য-মানুষের ভিড় নেই, যে পথ বেয়ে ক্লান্ত মানুষ ছুটেছে শান্তির সন্ধানে। কিন্তু প্রবোধকুমার সে দলের একজন হয়েও তার বৈশিষ্ট্য হারাল না। তার সংস্কার-মুক্ত মন এই ধূলিবিবর্জ্জিত পাহাড়ী হাওয়া বল-সঞ্চয় করল। দলের লোকে কেউ তাকে বললে নাস্তিক, কেউ বা সন্দেহ করল, যাত্রীদের অভ্যাসই তাই, কারণ তীর্থপর্যটনের পূর্ব্বে তাদের সংস্কারকে তারা চাবিবন্ধ করে আসেনা ঠাকুর ঘরে। প্রবোধ কিন্তু সত্যের সন্ধানে ছুটেছে, তার আত্মার শুভ্রতা তাই তার সকল কষ্ট সার্থক করে দিলে। এই বইখানির মধ্যে এমনু একটি সুনির্ম্মলতা ও সততা আছে যার স্পর্শে আমাদের হৃদয় পবিত্র হয়। আমি ইতিপূর্ব্বে একটা ইংরেজী সমালোচনা প্রকাশ করেছি, পড়ে দেখতে পার। সেইজন্য বেশী কিছু লিখলাম না। খবরের কাগজে যা সুখ্যাতি দেখছ তার একবর্ণও মিথ্যা নয়।

অবনী রায়ের অনুচ্চারিত ছোট গল্পের বই—সাদাসিদে, কোন ঘোর প্যাঁচ নেই ভাষার কিংবা গল্পাংশের, সুখপাঠ্য। একটা ভদ্রতা ও ভব্যতার ছাপ রয়েছে সর্ব্বত্র। কিন্তু মনকে আঘাত দিল না, অবনীবাবুর উদ্দেশ্যও ছিল না বোধ হয়। বইটা কি ধরণের জান? পুরাতন বন্ধুর মতন, এলে ধড়িয়ে উঠতে হয় না, বেহারা খবর দিলে যার আগমনে তাড়াতাড়ি জামা পরতে হয় না, কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়েই যাকে অভ্যর্থনা করা যায়। ভালই লাগে তাকে, অথচ 'তুই' বলতে সঙ্কোচ হয়, তার সঙ্গে তর্ক তুলে সরগরম করতে অনিচ্ছা হয়। কোথায় বিষ্ণু দে, আর কোথায় অবনী রায়! বিষ্ণুর কবিতা সোফায় শুয়ে পড়া

যায় না, অবনীর লেখা সোফায় শুয়েই পড়তে হয়। সেই জন্যই ত' লিখেছি গোড়াতে, আনন্দ নানা রকমের, কেনো না মানুষ ভারী খামখেয়ালী, বিশেষতঃ

তোমার অত্যাচারে জর্জ্জরিত
ধূর্জ্জটি দা

পুঃ—মহেন্দ্রবাবুর কিশলয় বইটার ভাল সমালোচনা উত্তরায় ছাপালে আমি সত্যই আনন্দিত হব। হয়ত আমি ভুল বুঝেছি তাঁকে—ঠিক্ জানি না, এই আমার মনের কথা। সুতিনী বইটা মাত্র অর্দ্ধেকটা পড়েছি, এখন পাচ্ছি না, উদ্ধার ক'রে পড়ব তারপর জানাব। পরে তোমাকে আরো ২।৪ খানি বইএর খবর দেবো বিশেষ করে অচিন্ত্যর নতুন বইগুলির।

ধূঃ

"কথাগুচ্ছ"—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ ১৫ কলেজ স্কোয়ার।

সাহিত্যজগতে ছোটগল্পের স্থান অতি উচ্চে। উপন্যাসে সাহিত্যের গতি এবং বৃদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ছোটগল্প হইতেই ইহার প্রাণের স্পন্দ [illegible] যায়। ছোটগল্প এবং উপন্যাসে প্রভেদ অনেক। উপন্যাসে যেমন অনেক কিছু গুছাইয়া বলিবার এবং অনেক ঘটনার ভিতর দিয়া জীবনের নানাদিক দেখাইবার অবসর আছে, ছোটগল্পে তেমন নাই; পরন্তু ইহাতে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অল্প আয়তনের ভিতর জীবনের অন্যসকল দিকের আভাসমাত্র দিয়া একটি বিশিষ্টদিকের ছবি ফুটাইয়া তুলিতে হয়;—বেশী কথা বলিবার সময় এবং পরিসর দুইয়েরি অভাব। এহিসাবে ছবি এবং গানের সহিত ছোটগল্পের একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ের আর্ট ছোটগল্পের আর্ট হইতে ভিন্ন হইলেও, মূলতঃ ইহাদের লক্ষ্য এক। ইহারা সকলেই মনের একটি বিশেষ তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া মনকে একটি বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে।

আর এইজন্যই উপন্যাসের অপেক্ষা ছোটগল্পের টেক্‌নিক বা কলাকৌশল আয়ত্ত করা অধিকতর কঠিন। মনে একটা জিনিষের কল্পনা করিয়া লইয়া অতি অল্প আয়তনে এবং অল্প কথায় তাহাকে রূপ ও প্রাণদান করা বিশেষ সহজসাধ্য নহে। ছোটগল্পে সংযমই প্রধান গুণ। এই সংযমের জন্যই ইহা অতি সহজে আমাদের অন্তঃস্তল স্পর্শ করে।

বাঙ্‌লা ছোটগল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা রূপকথা এবং ব্রতকথা হইতে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি অথবা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি যাহাই ইহাদের জন্ম দিয়া থাকুক না কেন, বাঙালী ভাবুক তাহার উপর নিজ কল্পনার রং চড়াইয়া এবং নিজের হৃদয়ের গোপন সহানুভূতি দিয়া তাহাদিগকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। রূপকথা এবং ব্রতকথার এইদিকটা আজিও বাঙ্‌লা গল্প সাহিত্য হইতে মুছিয়া যায় নাই। অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভাব্য ঘটনাবলী আজকালকার দিনে অচল হইলেও তাহাদের অন্তর্নিহিত গূঢ় মূলসূত্রটুকু—ওই সহানুভূতিপূর্ণ কল্পনা—আজিও ছোটগল্পের বনিয়াদ। দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রীমনোজ বসুর "অশ্বত্থামার দিদি" গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার পাত্রপাত্রীগুলি এখনও রূপকথার ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি তাহারা একালের জীব। ইহার উপর আধুনিক বাঙ্‌লা গল্প সাহিত্যকে পশ্চিম দিয়াছে আর্টবোধ ও গল্পের মানুষকে সত্যকার মানুষ বলিয়া ভাবিবার শক্তি। আধুনিক গল্পের নায়ক আমাদেরই পাঁচজনের একজন।—তাহাকে কেবল নীতিশিক্ষা দিতে অথবা দৈবশক্তির মহিমা প্রচার করিতে অবতারণা করা হয় না—তাহাকে দিয়া আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে তাহারই বিশেষ কোনও অংশ দেখান হয়।

পাশ্চাত্যপ্রভাব শুধু এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। পাশ্চাত্যপ্রভাব আমাদিগকে জীবনকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিতে শিখাইয়াছে। আগেকার মত আমরা আর যাহা ছিল তাহা লইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহিনা, আমরা জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি। ইহার ফলে আমাদের মনে একটা অস্থিরতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, চোখে দেখা জগতের পশ্চাতে যে নিগূঢ়তম জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাইতে আমরা উৎসুক।—কিন্তু আমাদের এ প্রচেষ্টা

এখনও সফল হয় নাই, কবে হইবে তাহাও জানা নাই,—এবং ইহার জন্য একটা ব্যর্থতার সুর আমাদের মন হইতে অহর্নিশ বাজিয়া উঠিতেছে। "কথাগুচ্ছে"র গল্পসংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলিই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার চিত্র।

আধুনিক বাঙ্‌লা ছোটগল্প বলিতে যাহা বুঝায় রবীন্দ্রনাথই তাহার আদিস্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে ইহার উল্লেখযোগ্য কোনও ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। যতদূর মনে হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "অঙ্গুরীয়কোপাখ্যান"-কে সর্ব্বপ্রথম ছোটগল্প আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরে "ভার্ণাকুলার ট্রানশ্লেশন সোসাইটি" কতকগুলি বিলাতী-গল্পের অনুবাদ করিয়া চালাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা", "রাধারাণী", "যুগলাঙ্গুরীয়ক" প্রভৃতিকে প্রথম মৌলিক ছোটগল্প বলিতে ইচ্ছা হয়,—কারণ এগুলি আয়তনে ছোট এবং একটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে একদৌড়ে গিয়া রবীন্দ্রনাথেরই নাম করা উচিত, যদিও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশী গল্পের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় "ফুলদানী" শীর্ষক লেখাটিই চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম অনুবাদ। তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরে নাম করিবার মত মৌলিক ছোটগল্প কেহ লিখিয়াছিলেন কিনা মনে পড়েনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাই যাহা করিলেন তাহাতে সহসা সাহিত্যের একটা নূতন দিক খুলিয়া গেল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে "হিতবাদী" ও "সাধনায়" গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। নূতনত্ব, বৈচিত্র্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের জন্য অনতিবিলম্বে তাঁহার গল্পগুলি সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করিল।

রবীন্দ্রনাথের বহুপরে শরৎচন্দ্র এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতে আরম্ভ করেন।—ইঁহারা কয়জনেই আধুনিক গল্প সাহিত্যের কর্ণধার। পরবর্ত্তী লেখকগণের উপর ইঁহাদের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিমাণে সকলের উপর রহিয়াছে।—ইঁহারা কলম ধরিবার পর হইতে গল্পসাহিত্য অসম্ভব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন নাম করা, নাম না করা, নাম করিবার মত এবং নাম না করিবার মত গল্পের এবং গল্পলেখকের অভাব নাই। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগকে ছোটগল্পের যুগ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবেনা।

আধুনিক বাঙ্‌লা গল্পসাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব খুব বেশী। প্রধানতঃ ভাবের আদান প্রদান এবং শিক্ষার ব্যাপকতা ইহার কারণ। বৈদেশিক কৃষ্টি [illegible] ইহার জন্য দায়ী। পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে আবার ফরাসী (—যথা মোঁপাসা) এবং রুশীয় (—[illegible]) গ্রন্থকারগণই আমাদের লেখকগণের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজে সাক্ষাৎ সম্পর্কে এ সকল প্রভাব হইতে মুক্ত। তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার নিজের এবং এ সৃষ্টি অননুকরণীয়।

ছোট গল্পের এত দিক দিয়া এবং এতভাবে উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে যে প্রত্যেক গল্পলেখকের প্রত্যেক গল্পটি পড়িয়া ইহার সম্বন্ধে ধারণা করা একরূপ অসম্ভব। এজন্য একটি ভাল ছোট গল্প-সংগ্রহের অভাব [illegible] অনুভূত হইতেছিল। "কথাগুচ্ছ" এই [illegible] সংগ্রহ। [illegible] পরিচিত প্রায় সকল ভাল লেখকের গল্প আছে এবং সকল গল্পগুলিই ভাল। [illegible] সংগ্রহে সকল লেখকের সকল দিক দেখা [illegible] নয়। উদাহরণ স্বরূপে প্রভাতবাবুর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রভাতবাবুর যে গল্প দুইটি ইহাতে [illegible] সে দুইটিই বিয়োগান্ত; অথচ মিলনান্তক গল্পে [illegible] সিদ্ধহস্ত ছিলেন,—তাঁহার মিলনান্তক এবং [illegible] (humarous) বহু গল্পই গল্পসাহিত্যের [illegible] অধিকার করিয়া আছে। তথাপি ইহা [illegible] করিতে বাধ্য যে, যে সব গল্প ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে লেখকদিগের সকল বিশেষত্ব না হউক, প্রধানগুলি [illegible] পাওয়া যাইবে। মোটের উপর "কথাগুচ্ছের" এই [illegible] ব্যাপকরূপে বাঙ্‌লা ছোটগল্পের আদর্শরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। "কথাগুচ্ছ" বাঙ্‌লা সাহিত্যের [illegible] প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ছোটদের বার্ষিকী—প্রকাশক—পপুলার এজেন্সী, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য এ যাবৎ যতগুলি বই লেখা হয়েছে, সেগুলির নাম মনে রাখতে হলে একটি তালিকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু একদিন শিশুসাহিত্যের এত বাহুল্য ছিল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পেয়েছে, তাই তাদের অফুরন্ত তাগিদা মেটাবার জন্য অজস্র বইও প্রকাশিত হচ্ছে। এত বেশী বই বেরোবার ফলে কিনবার সময় রীতিমত বিবেচনা ও বাছাই দরকার হয়ে পড়ে। এটা অবশ্য সুলক্ষণ। সম্প্রতি শারদীয়া পূজা উপলক্ষে যে ছোটদের বার্ষিকী বেরিয়েছে, তাদের এক হিসাবে সমস্যার পূরণ করবে বলে বিশ্বাস হয়।

অন্যান্য বারের বার্ষিকীর চেয়ে এ বৎসরের বইখানি বিশেষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। এই বার্ষিক-যজ্ঞের পুরোহিত-ভার নিয়াছেন কবি, যতীন্দ্রমোহন। সঙ্কলন-কার্য্যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন, তা সূচীপত্র থেকে অনুমান করা সহজ। শিশুর মনে কৌতূহল উদ্রেক করবার প্রচেষ্টা নানা দিক্ দিয়ে করা হয়েছে। প্রবীণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দবাবু, রমাপ্রসাদ চন্দ, ও চারু দত্ত মহাশয় এতে লেখা দিয়েছেন। আর শিশুসাহিত্য লিখে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁরাও লিখেছেন, যথা, অখিল নিয়োগী, সুনির্ম্মল বসু, অসিত হালদার এবং মোহনলাল। ছোটদের বার্ষিকীতে ছবি, গল্প, কবিতা, ও রসরচনা—কিছুরই অভাব নেই। সুনীতিবাবুর "আমাদের নামের পদবী" ও প্রবোধ বাগ্‌চী মহাশয়ের ঐতিহাসিক গল্পটি মনোজ্ঞ হয়েছে। এর ওপর ছাপা ও বাঁধাই সুদৃশ্য; সুতরাং এই রস-সম্ভারে ছোটদের রসনা তৃপ্ত হবে বলে বিশ্বাস করি।

সঙ্কলন-কার্য্য এক হিসাবে দুরূহ। কেননা সকলকে সন্তুষ্ট করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার; বিশেষতঃ শিশুদের সঙ্কলন কি ভাবে করা উচিত তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। পরশুরামের 'শিশু-সাহিত্য' লেখাটিতে সে প্রশ্নের মুখবন্ধ হয়েছে। আমোদের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের পুস্তক-প্রীতি যদি কাম্য হয়, তা হলে এই বার্ষিকীখানির নিশ্চয়ই মূল্য আছে।

সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

প্রিন্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২২৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
পাবলিশার :—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী ২০।৪৬, ভেলপুরা, কাশীধাম।